১.১. ভূমিকা (Introduction)

অর্থনীতি বা 'Economics' শব্দটি গ্রীক ভাষায় *'Oikonomikos'* শব্দ থেকে সৃষ্ট হয়েছে। এই গ্রীক শব্দটিকে দুটি ভাগে বিভক্ত করা যায় ঃ *'Oikos'* এবং *'Nomos'*। এখানে *'Oikos'* শব্দটির অর্থ 'গৃহ' (Home) এবং *'Nomos'* শব্দটির অর্থ 'পরিচালনা' (Management)। সুতরাং 'Economics' শব্দটির মূল অর্থ হল 'গৃহ পরিচালনা'। প্রকৃতপক্ষে একটি পরিবারের কর্তার সম্মুখে মূল সমস্যা হল পরিবারের সীমিত আয়ের পরিপ্রেক্ষিতে পরিবারের নানান চাহিদা পূরণ করা। কোনো দেশকে যদি বৃহদাকার পরিবার হিসাবে কল্পনা করা যায়, তবে সেখানেও সীমিত সম্পদের পরিপ্রেক্ষিতে সমাজের বিভিন্ন শ্রেণির মানুষের নানান অভাব পূরণ করার সমস্যাটি বিশেষ গুরুত্ব লাভ করে। সুতরাং অর্থনীতির বিভিন্ন তত্ত্বে এই সমস্যাই প্রতিফলিত হয়েছে। এই অধ্যায়ে আমরা অর্থনীতির সংজ্ঞা এবং অর্থনীতির মূল ধারণাগুলি সম্পর্কে আলোচনা করব।

১.২. অর্থনীতির সংজ্ঞা (Definition of Economics)

অর্থনীতিবিদ অ্যাডাম স্মিথ (Adam Smith), যাঁকে অর্থবিজ্ঞানের জনক হিসাবে গণ্য করা হয়, অর্থনীতির সংজ্ঞা নির্দেশ করতে গিয়ে উল্লেখ করেছিলেন যে— "অর্থনীতি হল এমন এক বিজ্ঞান যা দেশের সম্পদের প্রকৃতি ও কারণ অনুসন্ধান করে (.....a science which enquires into the nature and causes of wealth of nations)। তাঁর বিখ্যাত পুস্তক "An Enquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nation"–এ তিনি **কোনো দেশে উৎপাদন ও সম্পদ বিকাশের বিষয়ে বিশ্লেষণকেই অর্থনীতির মূল প্রতিপাদ্য বিষয়** (Economics as a study of wealth) হিসাবে চিহ্নিত করেছিলেন। এটিকে অর্থনীতির সম্পদ-কেন্দ্রিক সংজ্ঞা বলা যায়। তাঁর মতে দেশের জনগণের সুখস্বাচ্ছন্দ্য মূলত নির্ভর করে দেশের সম্পদের পরিমাণ বৃদ্ধির ওপর। অর্থাৎ তিনি সম্পদের বিকাশকেই অর্থনৈতিক কল্যাণের নির্দেশক হিসাবে বিবেচনা করেছিলেন। অর্থবিদ্যায় সম্পদ বলতে এমন সকল অর্থনৈতিক দ্রব্যের ভাণ্ডারকে বোঝায় যেগুলি থেকে নিয়মিতভাবে আয়-প্রবাহ সৃষ্ট হয়। যেমন, কৃষকের কাছে চাষযোগ্য জমি হল সম্পদ, কারণ সেই জমিতে চাষাবাদ করে নিয়মিত আয়-প্রবাহ সৃষ্টি করা যায়। আবার কোনো উৎপাদন সংস্থায় যন্ত্রপাতিসমূহকে সম্পদ হিসাবে গণ্য করা যায় কারণ ঐ সকল যন্ত্রপাতি ব্যবহারের মাধ্যমেই উৎপাদন ও আয়-প্রবাহ সৃষ্টি হয়। যে সকল সম্পদ উৎপাদনের কাজে ব্যবহৃত হয় সেগুলিকে ব্যবসায়িক সম্পদ বা **কারবারি সম্পদ** বলা যায় (যেমন, কারখানা, যন্ত্রপাতি, পরিবহন ও যোগাযোগ ব্যবস্থা, কাঁচামাল ইত্যাদি)। আবার যে সকল সম্পদের মালিকানা কোনো ব্যক্তি বা পরিবারের হস্তগত থাকে সেগুলিকে **ব্যক্তিগত সম্পদ** বলা যায় (যেমন, ব্যক্তিগত গাড়ি, জমি, বাড়ি, টাকা পয়সা ইত্যাদি)। তবে যে সকল সম্পদের মালিকানা কোনো নির্দিষ্ট ব্যক্তি বা গোষ্ঠীবিশেষের হাতে ন্যস্ত থাকে না সেগুলিকে সামাজিক বা **জাতীয় সম্পদ** বলা যায় (যেমন, দেশের রাস্তাঘাট, নদ-নদী, বনাঞ্চল, সরকারি উদ্যোগসমূহ, ইত্যাদি)।

অ্যাডাম স্মিথের মতো ফরাসী অর্থবিজ্ঞানী জাঁ ব্যাপতিস্তে সে (Jean Baptiste Say) মনে করতেন যে 'অর্থনীতি হল এমন বিজ্ঞান যা সম্পদের বিষয়ে আলোচনা করে' (Economics is the science which treats of wealth)। অর্থনীতিবিদ নাসাউ উইলিয়াম সিনিয়রও (Nassau William Senior) অর্থনীতির মূল প্রতিপাদ্য বিষয় হিসাবে 'সম্পদ' বিষয়ক অধ্যয়নকেই চিহ্নিত করেছিলেন। প্রকৃতপক্ষে অষ্টাদশ শতকের মধ্যভাগ থেকে ঊনবিংশ শতকের মধ্যভাগ পর্যন্ত যে সকল অর্থনীতিবিদ অর্থনীতির প্রধান আলোচ্য বিষয় হিসাবে দেশের 'সম্পদকে' অত্যধিক প্রাধান্য দিয়েছিলেন তাঁরা ধ্রুপদি অর্থবিজ্ঞানী (Classical economists)।

১.২.১. অর্থবিজ্ঞানের সম্পদ-কেন্দ্রিক' সংজ্ঞার মূল বৈশিষ্ট্য (Main features of wealth-centred definitions of Economics)

ধ্রুপদি অর্থবিজ্ঞানীগণ অর্থনীতির যে সম্পদ-কেন্দ্রিক সংজ্ঞা নির্দেশ করেছিলেন তার মূল বৈশিষ্ট্যগুলি হল ঃ

(১) **দেশে সম্পদ সৃষ্টিতে অত্যধিক গুরুত্ব ঃ** এই ধরনের সংজ্ঞায় যে কোনো অর্থব্যবস্থায় সম্পদ সৃষ্টির বিষয়টিকে প্রয়োজনাতিরিক্ত গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। ধ্রুপদি অর্থবিজ্ঞানীরা মনে করতেন, যে কোনো দেশে অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি নির্ভর করে দেশটিতে সম্পদ সৃষ্টির পরিমাণের ওপর।

(২) **সম্পদ সৃষ্টির কারণ অনুসন্ধান ঃ** কোনো দেশে কি কি উপায়ে সম্পদ সৃষ্টি করা সম্ভব সে বিষয়ের উপরেও এই সম্পদ-কেন্দ্রিক সংজ্ঞাগুলি গুরুত্ব আরোপ করেছে। যেমন, কোনো দেশে উৎপাদন ও রপ্তানি প্রসারের মাধ্যমে সম্পদ সৃষ্টি করা সম্ভব।

(৩) **সম্পদের প্রকৃতি সম্বন্ধে অধ্যয়ন ঃ** এই সংজ্ঞাসমূহে দেশের সম্পদ বলতে কেবলমাত্র বস্তুগত সম্পদকেই (material wealth) বোঝানো হয়েছে। অর্থাৎ, অবস্তুগত দ্রব্য বা সেবাদ্রব্যগুলিকে (যেমন, চিকিৎসক, শিক্ষক, প্রকৌশলী, গায়ক, ইত্যাদির পরিষেবা) সম্পদ হিসাবে গণ্য করা হয় না।

১.২.২. অর্থবিজ্ঞানের সম্পদ-কেন্দ্রিক সংজ্ঞার সমালোচনা (Criticisms of the wealth-centred definitions of Economics)

অর্থবিজ্ঞানকে কেবলমাত্র 'সম্পদের প্রকৃতি ও সম্পদ সৃষ্টির কারণ বিশ্লেষণ' হিসাবে চিহ্নিত করার ফলে ধ্রুপদি চিন্তাধারা নানাভাবে সমালোচিত হয়েছে।

(১) **মানব কল্যাণের বিষয়টি উপেক্ষিত হয়েছে ঃ** অর্থবিজ্ঞানের সম্পদ-কেন্দ্রিক সংজ্ঞায় কেবলমাত্র কোনো দেশে সম্পদ সৃষ্টির বিষয়টি প্রাধান্য পেয়েছে। কিন্তু জনসাধারণের অর্থনৈতিক কল্যাণ সৃষ্টির ক্ষেত্রে এই সম্পদকে কেবলমাত্র একটি উপাদান বলা যেতে পারে। অর্থাৎ, অর্থনৈতিক কল্যাণ সর্বোচ্চ করার লক্ষ্যে উপনীত হওয়ার জন্য সম্পদ সৃষ্টি একটি উপায় মাত্র। কিন্তু দেশে সম্পদ বণ্টনে যদি বৈষম্য দেখা দেয়, তবে সম্পদের অধিকাংশ মুষ্টিমেয় কিছু ধনীশ্রেণির মানুষের হাতে কেন্দ্রীভূত থাকে। সেক্ষেত্রে জনকল্যাণ সর্বোচ্চ হতে পারে না। অর্থাৎ, সাধারণ মানুষের কল্যাণের বিষয়টি এখানে অবহেলিত হয়েছে।

(২) **সম্পদের সঙ্কীর্ণ সংজ্ঞা ঃ** এই সংজ্ঞায় কেবলমাত্র বস্তুগত দ্রব্যসামগ্রীকেই সম্পদ হিসাবে গণ্য করা হয়েছে। অথচ বিভিন্ন অবস্তুগত বা সেবাদ্রব্যও সম্পদ হিসাবে গণ্য হয় (যেমন, স্বাস্থ্য পরিষেবা, শিক্ষা পরিষেবা ইত্যাদি)।

(৩) **মানুষের অর্থনৈতিক ও বস্তুবাদী দিকটির প্রতি অত্যধিক গুরুত্ব ঃ** এই সংজ্ঞা অনুযায়ী বলা যায় যে, কোনো মানুষের মূল উদ্দেশ্যই হল ব্যক্তিগত অর্থনৈতিক সুবিধা অর্জনের জন্য বস্তুগত সম্পদ আহরণ। অর্থাৎ মানবমনের অন্যান্য প্রবৃত্তি যেমন আনন্দ, ভালোবাসা, সহমর্মিতা, অনুকম্পা ইত্যাদি বিষয়গুলি এক্ষেত্রে উপেক্ষিত হয়েছে। এই কারণে টমাস কার্লাইল (Thomas Carlyle), জন রাস্কিন (John Ruskin) প্রমুখ চিন্তাবিদ এই ধরনের সংজ্ঞা-সম্পন্ন অর্থবিজ্ঞানকে 'রুটি-মাখনের বিজ্ঞান' (Bread and Butter Science), 'ধনদৌলতের অধিদেবতার আখ্যান' (Gospel of Mammon), 'এক বিষণ্ণ বিজ্ঞান' (a dismal Science) ইত্যাদি আখ্যা দিয়েছেন।

১.৩. অর্থনীতির আলোচ্য বিষয় হিসাবে 'মানুষ'কে প্রাধান্য (Economics as a study of Man)

ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রায় শেষ ভাগে কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থবিজ্ঞানী আলফ্রেড মার্শাল (Alfred Marshall) উল্লেখ করেন যে-'অর্থনীতি হল এমন এক শাস্ত্র, যা মানুষের দৈনন্দিন জীবনের সাধারণ কাজকর্ম নিয়ে আলোচনা করে' (Economics is a study of man in the ordinary business of life)। তাঁর মতে, কোনো সমাজব্যবস্থায় মানুষ কিভাবে তার বস্তুগত স্বাচ্ছন্দ্যলাভের জন্য আয় উপার্জন করে এবং উপার্জিত আয় সে কিভাবে ব্যয় করে, সে বিষয়ে অনুসন্ধান করে অর্থনীতি।

কাজেই মার্শাল প্রদত্ত অর্থনীতির সংজ্ঞায় বিশেষত বস্তুগত স্বাচ্ছন্দ্যলাভের প্রয়াসে মানুষের সম্পদ আহরণ সম্পর্কিত কার্যকলাপই গুরুত্ব পেয়েছে।

● **মার্শাল প্রদত্ত সংজ্ঞার বৈশিষ্ট্যসমূহ ঃ** অর্থনীতিবিদ মার্শাল অর্থনীতির যে সংজ্ঞা নির্দেশ করেছেন তার বৈশিষ্ট্যগুলি নিম্নরূপ ঃ

(১) **মানুষের অর্থনৈতিক কার্যকলাপের উপর অধিক গুরুত্ব ঃ** অর্থনীতির এই সংজ্ঞায় মানবজীবনের বস্তুগত সুখস্বাচ্ছন্দ্য নিশ্চিত করার লক্ষ্যে অর্থনৈতিক কার্যকলাপ হিসাবে মানুষের সম্পদ আহরণ এবং আয় সৃষ্টির প্রয়াসের উপরেই সর্বাধিক গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। অর্থাৎ ধ্রুপদি অর্থবিজ্ঞানীদের মতই এখানে 'সম্পদ' বিষয়টি উল্লিখিত হলেও এই সম্পদকে মানবজীবনের সুখস্বাচ্ছন্দ্য লাভের উপায় হিসাবে গণ্য করা হয়েছে।

(২) **মানুষের দৈনন্দিন জীবনের সাধারণ কার্যকলাপের উপর গুরুত্ব আরোপ ঃ** এই সংজ্ঞা অনুযায়ী মানুষ তার দৈনন্দিন জীবন নির্বাহের জন্য কিভাবে আয় উপার্জনের প্রয়াস চালায় এবং উপার্জিত আয় সে কিভাবে দৈনন্দিন বস্তুগত চাহিদা পূরণের কাজে ব্যয় করে, সেই বিষয়টিই অর্থনীতির আলোচ্য।

(৩) **জীবনের বস্তুগত কল্যাণের বিষয়টিকে প্রাধান্য ঃ** এই সংজ্ঞা অনুযায়ী মানবজীবনের বস্তুগত কল্যাণের (Material welfare) দিকটি অধিক গুরুত্ব লাভ করেছে। অর্থাৎ মনে করা হয়েছে যে মানবজীবনে স্বাচ্ছন্দ্যলাভের জন্য প্রয়োজনীয় বস্তুগত উপকরণগুলি হস্তগত হলেই অর্থনৈতিক কল্যাণ সর্বোচ্চ হবে।

● **মার্শাল প্রদত্ত সংজ্ঞার ত্রুটিসমূহ ঃ** যদিও মার্শাল প্রদত্ত 'অর্থনীতি'র সংজ্ঞায় মানুষের অর্থনৈতিক ক্রিয়াকলাপের দিকটি বিবেচিত হয়েছে, কিন্তু তা সত্ত্বেও এই সংজ্ঞার বিশেষ ত্রুটিগুলি হল নিম্নরূপ ঃ

(১) **মানবজীবনে স্বাচ্ছন্দ্যলাভের অবস্তুগত উপকরণসমূহের প্রতি উপেক্ষা ঃ** মানবজীবনে সুখস্বাচ্ছন্দ্য লাভের জন্য বস্তুগত উপকরণ যেমন প্রয়োজন, তেমনভাবে দক্ষতা, প্রশিক্ষণ, শিক্ষা, সততা ইত্যাদি অবস্তুগত বিষয়গুলিও অত্যন্ত জরুরি। কিন্তু মার্শাল প্রদত্ত অর্থনীতির সংজ্ঞায় এই অবস্তুগত উপকরণগুলি উপেক্ষিত হয়েছে।

(২) **অর্থনীতির আলোচ্য বিষয়ের পরিধি সঙ্কীর্ণ হয়েছে ঃ** মানবজীবনের বস্তুগত কল্যাণের দিকটিকে অধিক গুরুত্ব প্রদান করায় মার্শাল প্রদত্ত 'অর্থনীতি'র সংজ্ঞায় অর্থনীতির আলোচ্য বিষয়ের পরিধি সঙ্কীর্ণ হয়ে পড়েছে। অধ্যাপক লায়োনেল রবিনস্ (Lionel Robbins) মনে করেন যে, বিভিন্ন অবস্তুগত সেবাদ্রব্যও মানবকল্যাণ সাধনে জরুরি। যেমন, চিকিৎসকের পরিষেবা, প্রকৌশলীর পরিষেবা ইত্যাদি অবস্তুগত সেবাদ্রব্যও মানুষের জীবনে স্বাচ্ছন্দ্য বা অর্থনৈতিক কল্যাণ সুনিশ্চিত করার জন্য অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। এই সেবাদ্রব্যগুলির যোগান চাহিদার তুলনায় কম হওয়ায় এইগুলি অর্থের বিনিময়েই ক্রয় করতে হয়।

(৩) **'কল্যাণের' বস্তুগত পরিমাপ অসুবিধাজনক ঃ** 'কল্যাণ' (Welfare) একটি মানসিক বিষয়। কাজেই এই বিষয়টির বস্তুগত পরিমাপ অত্যন্ত অসুবিধাজনক। অধ্যাপক রবিনস্-এর মতে, অর্থনীতি এমন আদর্শগত মূল্যমান বিচারের (normative value judgement) পরিবর্তে কেবলমাত্র অর্থনৈতিক ক্রিয়াকলাপের কারণ এবং তার পরিমাপযোগ্য প্রভাবসমূহের প্রতি দৃষ্টিপাত করে। যেমন, সিগারেট বা নেশাদ্রব্য উৎপাদন ও ভোগ মানব কল্যাণ বৃদ্ধি করে না, কিন্তু এই সকল দ্রব্যের উৎপাদন ও ভোগের বিষয়ও অর্থনীতির আলোচ্য বিষয়।

১.৪. সম্পদের পুঞ্জীভবনের ক্ষেত্রে অপর্যাপ্ত সম্পদের দক্ষ ব্যবহারের গুরুত্ব (Importance of the efficient utilisation of scarce resources for the accumulation of wealth)

বিংশ শতাব্দীর গোড়ায় পাশ্চাত্য অর্থনৈতিক তত্ত্ব ও সামাজিক প্রতিষ্ঠানগত কাঠামোতে (Social institutions) কোনো সমাজব্যবস্থায় সম্পদের পুঞ্জীভবনের ক্ষেত্রে দেশের অপর্যাপ্ত উপকরণসমূহের দক্ষ ব্যবহারের বিষয়টিকেই অর্থনীতির প্রধান আলোচ্য বিষয় হিসাবে চিহ্নিত করা হয়। 1932 খ্রিস্টাব্দে অধ্যাপক লায়োনেল রবিনস্ তাঁর রচিত "Essays on Nature and Significance of the Economic Science" পুস্তকে উল্লেখ করেন যে—"Economics is a science which studies human behaviour as a relationship between ends and scarce means which have alternative uses." অর্থাৎ রবিনস্-এর মতে, 'অর্থনীতি হল এমন এক বিজ্ঞান যেটি বিকল্প ব্যবহার উপযোগী সীমিত উপকরণগুলির সাহায্যে বিভিন্ন উদ্দেশ্য সিদ্ধি এবং তার সাথে সম্পর্কযুক্ত মানুষের আচরণ বিশ্লেষণ করে'। পরবর্তী সময়ে অর্থনীতিবিদ সিটভস্কি (Scitovsky) এবং ক্যাসেল (Cassel) অর্থনীতির বিষয়বস্তু হিসাবে অনুরূপ সংজ্ঞা নির্দেশ করেছিলেন।

তাঁদের এই ধরনের সংজ্ঞার মূল প্রতিপাদ্য বিষয়গুলি হল ঃ

(১) **মানুষের অভাব অসীম ঃ** এই সংজ্ঞা অনুযায়ী মানুষের অভাবের কোনো সীমা নেই। প্রতিনিয়ত মানুষ নানা ধরনের দ্রব্য ও সেবাকর্মের অভাব বোধ করে। একটি অভাব পূরণ হওয়া মাত্রই অপর একটি অভাব সৃষ্টি হয়।

(২) **অভাব পরিপূরণের উপকরণসমূহের অপর্যাপ্ত যোগান ঃ** মানুষের অভাব অসীম হলেও সেই অভাব পরিপূরণের জন্য যে সকল উপকরণ প্রয়োজন, অর্থনীতিতে সেই সকল উপকরণের যোগান কিন্তু পর্যাপ্ত নয়। যেমন, বিভিন্ন দ্রব্য উৎপাদনের জন্য জমি, শ্রম, মূলধন, উদ্যোগ ইত্যাদি উপকরণের যোগান প্রয়োজন। কিন্তু কোনো অর্থব্যবস্থায় জমির যোগান সীমিত। তাছাড়া দক্ষ শ্রমিকের যোগানও প্রয়োজনের তুলনায় যথেষ্ট নয়। এছাড়া মানুষের নানা অভাব পরিপূরণের জন্য যে বিপুল পরিমাণ দ্রব্য ও সেবাকর্ম উৎপাদন করা প্রয়োজন, সে তুলনায় বিনিয়োগযোগ্য মূলধনের যোগানও পর্যাপ্ত নয়। বেশির ভাগ স্বল্পোন্নত দেশ অপর্যাপ্ত মূলধনের সমস্যায় ভোগে। এছাড়া দেশে ঝুঁকি গ্রহণে আগ্রহী এবং উদ্ভাবনী শক্তিসম্পন্ন উদ্যোক্তারও অভাব দেখা যায়। কাজেই মানুষের অভাব পরিপূরণের জন্য প্রয়োজনীয় উপকরণসমূহের সীমিত যোগান সমস্যা সৃষ্টি করে।

(৩) **অপর্যাপ্ত সম্পদগুলির বিকল্প ব্যবহারের সুযোগ ঃ** অর্থনীতির এই সংজ্ঞা অনুযায়ী কোনো দেশে অপর্যাপ্ত সম্পদসমূহের বিকল্প ব্যবহারের সুযোগ থাকে। যেমন, একখণ্ড জমিকে চাষের কাজে নিযুক্ত করা যেতে পারে, আবার ঐ জমিকে কারখানাবাড়ি অথবা সাধারণের বাসযোগ্য বহুতল ফ্ল্যাটবাড়ি নির্মাণে ব্যবহার করা হতে পারে।

(৪) **অপর্যাপ্ত সম্পদের দক্ষ ব্যবহার ঃ** যেহেতু কোনো অর্থব্যবস্থায় অপর্যাপ্ত সম্পদসমূহের বিকল্প ব্যবহার সম্ভব, সেহেতু এই ধরনের সম্পদকে এমন উৎপাদনের কাজে নিযুক্ত করা উচিত যেখানে এই সীমিত সম্পদের (বা উৎপাদনের উপকরণের) দক্ষ ব্যবহার সম্ভব। অর্থাৎ, এই সীমিত সম্পদকে উপযুক্ত প্রকৌশলের সাহায্যে সর্বোচ্চ সম্ভব দ্রব্য ও সেবাকর্ম সৃষ্টির কাজে ব্যবহার করা উচিত।

(৫) **অপর্যাপ্ত সম্পদের উপযুক্ত নিয়োগের ক্ষেত্র নির্বাচন ঃ** মানুষের অভাবের কোনো সীমা নেই, তবে এই অভাবসমূহের মধ্যে গুরুত্ব অনুসারে কিছু কিছু অভাব পূরণের প্রয়োজনীয়তা অধিক বলে গণ্য হতে পারে। যেমন, অন্ন, বস্ত্র এবং বাসস্থানের অভাব বা প্রাথমিক অভাব প্রথমে পূরণ করা দরকার। কাজেই গুরুত্ব অনুসারে অভাবসমূহের শ্রেণিবিন্যাস করে অপর্যাপ্ত সম্পদসমূহকে ঐ ধরনের অভাবপূরণে সমর্থ দ্রব্যসমূহ উৎপাদনের ক্ষেত্রে নিযুক্ত করতে হবে। বিভিন্ন উৎপাদন ক্ষেত্রের মধ্যে অপর্যাপ্ত সম্পদসমূহের উপযুক্ত বণ্টনের বিষয়টি এক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ। উৎপাদনের ক্ষেত্র নির্বাচন করে অপর্যাপ্ত সম্পদগুলিকে সেই সকল উৎপাদনের কাজে ব্যবহার করতে হবে যাতে মানুষ সর্বাধিক প্রয়োজনীয় দ্রব্য ও সেবাকর্মের প্রাপ্তির মাধ্যমে তৃপ্ত হতে পারে।

১.৪.১. 'অর্থনীতি'র অপর্যাপ্ত সম্পদ-ভিত্তিক সংজ্ঞার সমালোচনা (Criticism of the scarcity-oriented definition of Economics)

যদিও অর্থনীতির সংজ্ঞা বা অর্থনীতির মূল বিষয়বস্তুর দিক নির্দেশের বিষয়ে রবিনস্ প্রদত্ত অপর্যাপ্ত সম্পদ-ভিত্তিক সংজ্ঞা পূর্বের সংজ্ঞাগুলির তুলনায় অধিক গ্রহণযোগ্য, কিন্তু তা সত্ত্বেও এই দৃষ্টিভঙ্গিটি নানাভাবে সমালোচিত হয়েছে।

(১) **অর্থনৈতিক সম্প্রসারণ ও উন্নয়নের বিষয়ে অবজ্ঞা ঃ** এই সংজ্ঞা অনুসারে কোনো দেশে সম্পদসমূহের স্থির যোগান এবং বিভিন্ন উৎপাদনের ক্ষেত্রে ঐ নির্দিষ্ট পরিমাণ সম্পদের উপযুক্ত বণ্টনের বিষয়টি গুরুত্বলাভ করেছে। কিন্তু কোনো অর্থব্যবস্থায় অর্থনৈতিক সম্প্রসারণ (economic growth) এবং অর্থনৈতিক উন্নয়নের (economic development) বিষয়গুলির প্রতি যথাযথ গুরুত্ব প্রদান করা হয়নি। 'অর্থনৈতিক সম্প্রসারণ' কোনো অর্থব্যবস্থায় অর্থনৈতিক প্রসারের পরিমাণগত দিক (quantitative aspects) নির্দেশ করে। অর্থাৎ, দেশের মোট উৎপাদন, দ্রব্যভোগ, সামগ্রিক বিনিয়োগ ও সঞ্চয় ইত্যাদি পরিমাপযোগ্য বিষয়গুলির ক্রমশ বৃদ্ধি অর্থনৈতিক সম্প্রসারণকে নির্দেশ করে। অন্যদিকে অর্থনৈতিক উন্নয়নের ধারণাটি অর্থনৈতিক প্রগতির গুণগত দিকটির প্রতি (qualitative aspects) দৃষ্টি নিক্ষেপ করে। অর্থাৎ, জাতীয় উৎপাদন এবং আয় বৃদ্ধির সাথে সাথে সাধারণ মানুষের জীবনধারণের মান উন্নয়ন, শিক্ষিতের হার বৃদ্ধি, গড় পরমায়ু বৃদ্ধি,

আয়-বৈষম্য হ্রাস, শিশুমৃত্যুর হার হ্রাস ইত্যাদি বিষয়গুলি অর্থনৈতিক উন্নয়নের নির্দেশক। অর্থাৎ বর্তমানে যে কোনো অর্থব্যবস্থায় অপর্যাপ্ত সম্পদসমূহের দক্ষ ব্যবহারই নয়, অর্থনৈতিক সম্প্রসারণ এবং উন্নয়নের লক্ষ্য সমানভাবে গুরুত্বপূর্ণ।

(২) **জাতীয় আয় ও কর্মসংস্থান নির্ধারণের বিষয়ে যথাযথ গুরুত্বপ্রদানে অভাব ঃ** অর্থনীতির এই সংজ্ঞা কোনো অর্থব্যবস্থায় বিভিন্ন উৎপাদনের ক্ষেত্রে অপরিমিত সম্পদের বণ্টনের বিষয়টির উপর বেশি গুরুত্ব আরোপ করেছে। অর্থাৎ অপর্যাপ্ত সম্পদের বণ্টনের বিষয়টির উপর আলোকপাত করাই যেন অর্থনীতির মূল আলোচ্য বিষয়। কিন্তু বাস্তবে জাতীয় উৎপাদন ও কর্মনিয়োগ নির্ধারণ, দ্রব্যমূল্যস্তর এবং জাতীয় উৎপাদন ও আয়ের উত্থান-পতনের বিশ্লেষণ ইত্যাদি বিষয়ও অর্থনীতির আলোচ্য বিষয়। এই সংজ্ঞায় অবশ্য অর্থনীতির এই ব্যাপকতর পরিধি অগ্রাহ্য করা হয়েছে।

(৩) **উদ্বৃত্ত যোগান হেতু সৃষ্ট সমস্যার দিকটি অবহেলা ঃ** এই সংজ্ঞা অনুযায়ী উৎপাদনের উপকরণের অপর্যাপ্ত যোগানই অর্থনৈতিক সমস্যা সৃষ্টির মূল কারণ। কিন্তু উৎপাদনের উপকরণসমূহের উদ্বৃত্ত যোগানের কারণেও সমস্যা সৃষ্টি হতে পারে। যেমন, 1930-এর দশকে বিশ্বব্যাপী অর্থনৈতিক মন্দার কারণে বিভিন্ন দ্রব্যের যোগানের তুলনায় চাহিদা স্বল্প হয়ে পড়ে। ফলে উৎপাদনের উপকরণগুলির চাহিদাও হ্রাস পায়। উৎপাদনের উপকরণগুলির যোগানের তুলনায় চাহিদার পরিমাণ স্বল্প হওয়ার ফলে উপকরণসমূহের উদ্বৃত্ত যোগানের সমস্যা দেখা দেয়।

(৪) **অর্থনৈতিক দিক থেকে সমৃদ্ধ দেশগুলিতে এই সংজ্ঞা অপ্রাসঙ্গিক ঃ** যে সকল দেশ অর্থনৈতিক দিক থেকে সমৃদ্ধ এবং যেক্ষেত্রে উৎপাদনের উপকরণসমূহের অপর্যাপ্ত যোগান রয়েছে, সেখানে অপর্যাপ্ত সম্পদের দক্ষ ব্যবহারের তুলনায় উচ্চ ভোগের স্তর বজায় রাখা এবং দ্রব্যসমূহের যথাযথ বণ্টনের বিষয়টি বেশি গুরুত্ব লাভ করে।

১.৫. অর্থনীতির সম্প্রসারণ-ভিত্তিক সংজ্ঞা (Growth-oriented definition of Economics)

অর্থনীতিবিদ রবিনস্ অর্থনীতির অপর্যাপ্ত সম্পদভিত্তিক যে সংজ্ঞা নির্দেশ করেছিলেন সেখানে অর্থনৈতিক সম্প্রসারণের (economic growth) বিষয়টি যথেষ্ট গুরুত্ব পায় নি। এই কারণে আধুনিক অর্থনীতিবিদ পল স্যামুয়েলসন (Paul Samuelson) গতিশীল অর্থব্যবস্থায় অর্থনীতির সংজ্ঞা নির্দেশ করে বলেছেন যে— "বিনিময়ের মাধ্যম হিসাবে অর্থ ব্যবহার করেই হোক বা না করেই হোক, কোনো সমাজে মানুষ বিকল্প ব্যবহারের উপযোগী উৎপাদনশীল অথচ অপর্যাপ্ত সম্পদসমূহকে বর্তমান তথা ভবিষ্যতে সমাজের বিভিন্ন মানুষের প্রয়োজনীয় ভোগ্যদ্রব্য উৎপাদনের কাজে প্রয়োগ করার জন্য ক্ষেত্র নির্বাচনের বিষয়টি যেভাবে বিবেচনা করে তা বিশ্লেষণ করাই অর্থনীতির মূল প্রতিপাদ্য বিষয়"।

স্যামুয়েলসন প্রদত্ত এই সংজ্ঞার মূল বৈশিষ্ট্যগুলি হল ঃ

(১) **অর্থনৈতিক সম্প্রসারণের উপর গুরুত্ব ঃ** সময়ের অগ্রগতির সাথে সাথে জাতীয় উৎপাদন বৃদ্ধির ধারা অর্থনৈতিক সম্প্রসারণ সূচিত করে। স্যামুয়েলসন প্রদত্ত অর্থনীতির সংজ্ঞায় উৎপাদনের প্রয়োজনে দেশের অপর্যাপ্ত সম্পদের যথাযথ ব্যবহারই নয়, উৎপাদিত দ্রব্যসমূহের ক্রমাগত বৃদ্ধি বা জাতীয় উৎপাদনের বৃদ্ধির গতির ওপরেও গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে।

(২) **ভোগ বণ্টনে গতিশীলতা ঃ** এই সংজ্ঞায় বলা হয়েছে যে, অর্থনীতি কেবলমাত্র সমাজের বর্তমান ভোগই নয়, ভবিষ্যতে ভোগ বৃদ্ধির প্রতিও সমান প্রাধান্য দেয়। অর্থাৎ দেশের আয়কে বর্তমান ও ভবিষ্যৎ ভোগব্যয়ের মধ্যে বিভাজন বা বণ্টনের বিষয়টিও অর্থনীতির আলোচ্য বিষয়।

(৩) **সমাজের বিভিন্ন শ্রেণির মানুষের মধ্যে ভোগ্যদ্রব্য বণ্টনের বিষয়টিকে প্রাধান্য ঃ** কোনো সমাজে শুধুমাত্র উৎপাদন বৃদ্ধিই নয়, সমাজের বিভিন্ন শ্রেণির মানুষের মধ্যে উৎপাদিত দ্রব্যসমূহ বণ্টনের বিষয়টিও এই সংজ্ঞায় প্রাধান্য লাভ করেছে। অর্থাৎ সমাজে বিভিন্ন শ্রেণির মানুষের মধ্যে দ্রব্যসমূহ বণ্টনে বৈষম্য যদি কমিয়ে আনা যায়, তবেই সামাজিক ন্যায় প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব হয়।

(৪) **অপর্যাপ্ত সম্পদের যথার্থ বণ্টন থেকে প্রাপ্ত সুবিধা ঃ** অর্থনীতিবিদ স্যামুয়েলসন মনে করেন যে, সমাজের বর্তমান ও ভবিষ্যৎ ভোগের প্রয়োজনীয়তার দিকে লক্ষ্য রেখে দেশের অপর্যাপ্ত উৎপাদনের উপকরণগুলিকে কোনো উৎপাদনের ক্ষেত্র থেকে সরিয়ে এনে যথার্থ উৎপাদনের ক্ষেত্রে নিযুক্ত করা এবং তা থেকে প্রাপ্ত সুবিধার বিষয়টিও অর্থনীতির আলোচনার অন্তর্ভুক্ত।

১.৬. অর্থনৈতিক সাম্য ও ন্যায় প্রতিষ্ঠা এবং মানব উন্নয়ন ঃ অর্থনৈতিক প্রগতির বিকল্প ব্যাখ্যার প্রয়োজনীয়তা (Human development and establishment of equity and justice : Need for an alternative approach towards economic progress)

আমরা ইতিমধ্যেই লক্ষ্য করেছি যে পাশ্চাত্য অর্থবিজ্ঞানীগণ কোনো অর্থব্যবস্থায় সম্পদের দক্ষ ব্যবহারের মাধ্যমে জাতীয় ও মাথাপিছু উৎপাদন বৃদ্ধিকেই অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির নির্দেশক হিসাবে গণ্য করেছেন। কিন্তু থার্লওয়াল (Thirlwall), টোডারো (Todaro), সিয়ার্স (Seers), গুলে (Goulet) প্রমুখ অর্থনীতিবিদের মতে 1940 থেকে 1960-এর দশকে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে উৎপাদনের গতি-প্রকৃতি বিশ্লেষণ করলে বোঝা যায় যে, পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে জাতীয় ও মাথাপিছু উৎপাদন বৃদ্ধি পেলেও (ক) একদিকে পৃথিবীর উন্নত ও স্বল্পোন্নত দেশগুলির মধ্যে অর্থনৈতিক দূরত্ব বৃদ্ধি পেয়েছে এবং (খ) অন্যদিকে স্বল্পোন্নত বা উন্নয়নশীল দেশগুলিতে মাথাপিছু উৎপাদন ও আয় বৃদ্ধি পেলেও, বেশির ভাগ ক্ষেত্রে সমাজে আয়বণ্টনে বৈষম্যও বৃদ্ধি পেয়েছে।

এই কারণে 1970-এর দশক থেকে বিভিন্ন অর্থনীতিবিদ কোনো দেশের অর্থনৈতিক প্রগতির নির্দেশক হিসাবে কেবলমাত্র মাথাপিছু আয় বৃদ্ধিকেই গণ্য করা যায় কিনা সে বিষয়ে দ্বিমত পোষণ করেন। যেমন 1971 সালে অর্থনীতিবিদ ইরমা এডেলম্যান (Irma Adelman) এবং সিন্থিয়া মরিস (Cynthia T. Morris) কোনো দেশে শিক্ষিতের হার, মৃত্যুহার ইত্যাদির ওপর ভিত্তি করে **জীবনধারণের গুণগত মান নির্দেশক একটি সূচক** প্রস্তুত করেন (Physical Quality of Life Index বা PQLI)। অর্থাৎ তাঁদের মতে কোনো দেশে মাথাপিছু আয় বৃদ্ধির সাথে সাথে যদি মৃত্যুহার এবং অশিক্ষিতের হারও বৃদ্ধি পায় এবং জীবনধারণের গুণগত মান (যেটি মানুষের প্রয়োজনীয় খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান, শিক্ষা, স্বাস্থ্য পরিষেবা ইত্যাদি প্রাপ্তির উপর নির্ভরশীল) হ্রাস পায়, তবে সেই দেশকে অর্থনৈতিক দিক থেকে সমৃদ্ধ বলা যাবে না। অর্থনীতিবিদ লা মিন্ট (Hla Myint)-এর মতে মাথাপিছু আয়ের পরিমাপটি পরিসংখ্যানগত ও ধারণাগত দিক থেকে কোনো দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের দিক নির্দেশে অসমর্থ। কারণ মাথাপিছু আয় একটি পরিসংখ্যানগত গড় মাত্র। অর্থাৎ মাথাপিছু আয় বৃদ্ধি পেলে প্রতিটি মানুষের অর্জিত আয়ের পরিমাণই যে বৃদ্ধি পাবে তা নিশ্চিত নয়। কারণ দেশের মোট আয়ের অধিকাংশ মুষ্টিমেয় কিছু মানুষের হাতে কেন্দ্রিভূত থাকতে পারে। অন্যদিকে তাঁর মতে, মাথাপিছু আয় অপেক্ষা মাথাপিছু ব্যয় জীবনধারণের গুণগত মানের নির্দেশক হিসাবে অধিক গ্রহণযোগ্য। কারণ মানুষ তার আয়ের সাহায্যে জীবনধারণের জন্য প্রয়োজনীয় দ্রব্য ক্রয় করতে সক্ষম কিনা সে বিষয়টি অধিক গুরুত্বপূর্ণ। অধ্যাপক অমর্ত্য সেনও মনে করেন যে মাথাপিছু আয় নয়, মাথাপিছু ভোগব্যয়ের সক্ষমতা (capability) এবং বিভিন্ন মানুষের বিভিন্ন ধরনের অভাব ও প্রয়োজনীয়তা অনুযায়ী বিভিন্ন দ্রব্য ও সেবাকর্ম প্রাপ্তির বিষয়টি দ্বারাই জীবনধারণের স্বাচ্ছন্দ্য সূচিত হয়। এর সাথে মানুষের বিভিন্ন দ্রব্য ও সেবাকর্মের প্রাপ্তির অধিকারকেও (entitlement) অধ্যাপক সেন সমান গুরুত্ব দিয়েছেন। তাঁর মতে কোনো সমাজে বেশির ভাগ মানুষের ক্ষেত্রে দ্রব্য ও সেবাকর্মসমূহের প্রাপ্তির এই অধিকার ও সক্ষমতার ক্রমাগত বিস্তারকে অর্থনৈতিক উন্নয়নের নির্দেশক হিসাবে গণ্য করা যায়। কোনো অর্থনীতিতে বাজার ব্যবস্থা, গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা, সামাজিক দিক থেকে প্রয়োজনীয় দ্রব্য ও সেবাকর্মসমূহ সরবরাহের ক্ষেত্রে সরকারের ভূমিকা ইত্যাদি বিষয় সাধারণ মানুষের এই অধিকার ও সক্ষমতার মাত্রা নির্ধারণ করে।

পাশ্চাত্য অর্থবিজ্ঞানীদের ধারণা অনুসারে কেবল জাতীয় আয় ও মাথাপিছু আয় বৃদ্ধি পেলেই তাকে অর্থনৈতিক প্রগতির নির্দেশক হিসাবে গণ্য করা যায়, কারণ তাঁদের মতে উৎপাদন ও আয় বৃদ্ধির এই সুফল আপনাআপনি সমাজের সকল শ্রেণির মানুষের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ে। একে **'চুঁইয়ে পড়ার তত্ত্ব'** বা 'Trickle down theory' বলা হয়। কিন্তু আধুনিক অর্থবিজ্ঞানীরা মনে করেন এই তত্ত্বটি যথার্থ নয়। যেমন, 1960-74 সালের মধ্যে ব্রাজিলের মাথাপিছু আয় প্রায় দ্বিগুণ হওয়া সত্ত্বেও সেখানে আয়বণ্টনের বৈষম্যও সাথে সাথে বৃদ্ধি পেয়েছিল। এই কারণে আধুনিক অর্থনীতিবিদগণ মনে করেন যে, অর্থনীতির আলোচ্য বিষয় শুধুমাত্র **অর্থনৈতিক সম্প্রসারণ বা জাতীয় ও মাথাপিছু আয় বৃদ্ধির গতিই নয়, আয় বণ্টনে বৈষম্য হ্রাস ও সামাজিক ন্যায় প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে যথার্থ অর্থনৈতিক উন্নয়নও এর অন্তর্ভুক্ত।**

অর্থনীতিবিদ ডেনিস গুলে (Denis Goulet) অর্থনৈতিক উন্নয়নের **তিনটি** মৌলিক উপাদান নির্দেশ করেছেন ঃ

(১) জীবনরক্ষার জন্য পুষ্টিসাধন (Life-sustenance),

(২) আত্মমর্যাদাবোধ (Self-esteem) এবং

(৩) মুক্তি (Freedom)।

তাঁর মতে মানুষের জীবনধারণের জন্য প্রয়োজনীয় খাদ্য, বস্ত্র ও বাসস্থানের সংস্থানকেই সামগ্রিকভাবে জীবনরক্ষার জন্য 'পুষ্টিসাধন' বলা যায়। অর্থাৎ যে দেশে বেশির ভাগ মানুষ এই পুষ্টিসাধনে বঞ্চিত সেই দেশকে যথার্থ উন্নত দেশ বলা যাবে না। আবার কোনো দেশে যদি বেশির ভাগ মানুষ আত্মমর্যাদার সাথে জীবনধারণে অসমর্থ হয়, তবে সেই দেশটিকেও অর্থনৈতিক দিক থেকে যথার্থ উন্নত দেশ বলা যাবে না। অর্থাৎ যথার্থ নাগরিক অধিকার প্রাপ্তি এবং সমাজে সম্মান ও মর্যাদার সাথে বেঁচে থাকার অধিকার থেকে বেশির ভাগ মানুষ যদি বঞ্চিত হয়, তবে সেক্ষেত্রে অর্থনৈতিক বিকাশকে প্রকৃত উন্নয়ন বলা যাবে না।

অন্যদিকে দারিদ্র্য, কুসংস্কার এবং অজ্ঞতার হাত থেকে মুক্তিকেই এখানে যথার্থ 'মুক্তি' বা 'স্বাধীনতা' বলা হয়েছে। অর্থাৎ, উপযুক্ত শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ প্রাপ্তি এবং বর্ধিত আয়ের সাহায্যে প্রয়োজনীয় দ্রব্য ও সেবা নির্বাচনের স্বাধীনতার ক্রমবিকাশ কোনো দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের একটি অন্যতম উপাদান। কাজেই দেশের মানুষের শারীরিক ও বৌদ্ধিক বিকাশ, আয় বণ্টনে বৈষম্য হ্রাস ও সামাজিক ন্যায় প্রতিষ্ঠা ইত্যাদি বিষয় মানব উন্নয়নকে সূচিত করে।

সুতরাং কোনো দেশের আর্থিক বিকাশ কেবলমাত্র জাতীয় আয় ও মাথাপিছু আয়ের পরিমাণগত পরিমাপের মধ্যে আবদ্ধ থাকলে চলবে না। এর সাথে মানব উন্নয়নের গুণগত দিকটিও অন্তর্ভুক্ত হবে।

১.৭. অর্থনৈতিক তত্ত্বের দুটি শাখা ঃ ব্যষ্টিগত ও সমষ্টিগত অর্থনীতি (Two branches of economic theory : Microeconomics and Macroeconomics)

অর্থনৈতিক তত্ত্বের যে নানা শাখা রয়েছে তাদের মধ্যে দুটি মৌলিক শাখা হল ব্যষ্টিগত অর্থনীতি এবং সমষ্টিগত অর্থনীতি।

● **ব্যষ্টিগত অর্থনীতি** (Microeconomics) ঃ অর্থনৈতিক তত্ত্বের যে শাখা কোনো অর্থব্যবস্থায় বিভিন্ন অর্থনৈতিক এককের (যেমন, কোনো ভোক্তা বা কোনো উদ্যোক্তা) ব্যক্তিগত অর্থনৈতিক সিদ্ধান্তের উপর আলোকপাত করে তাকেই **ব্যষ্টিগত অর্থনীতি** বলে। যেমন, কোনো ভোক্তা তার নির্দিষ্ট আয় এবং ভোগ্যদ্রব্যের নির্দিষ্ট বাজারদামের পরিপ্রেক্ষিতে তার ভোগসন্তুষ্টির কাম্যতমকরণের লক্ষ্যে পরিচালিত হয়। একইভাবে কোনো উদ্যোক্তা তার নির্দিষ্ট ব্যয় পরিকল্পনা ও উপাদানসমূহের নির্দিষ্ট বাজারদামের পরিপ্রেক্ষিতে মুনাফা সর্বোচ্চকরণের লক্ষ্যে উৎপাদন কাজ পরিচালনা করে। ব্যক্তিবিশেষে ভোক্তা ও উদ্যোক্তার এই অর্থনৈতিক আচরণ ব্যষ্টিগত অর্থনীতির আলোচ্য বিষয়।

১.৭.১. ব্যষ্টিগত অর্থনীতির প্রয়োজনীয়তা (Usefulness of Microeconomics)

কোনো ভোক্তা দ্রব্যভোগ থেকে প্রাপ্ত উপযোগ সর্বোচ্চ করার জন্য কি পরিমাণ দ্রব্য ভোগ করবে, অথবা কোনো উদ্যোক্তা তার মুনাফা সর্বোচ্চ করার জন্য কি পরিমাণ দ্রব্য উৎপাদন করবে এবং কি দামে ইত্যাদি প্রশ্নের সুরাহার জন্যই ব্যষ্টিগত অর্থনীতির আলোচনা প্রয়োজন।

(ক) **বিভিন্ন দ্রব্যের চাহিদার প্রকৃতি নির্ধারণ ঃ** কোনো অর্থব্যবস্থায় কোনো দ্রব্যের বাজার-চাহিদার প্রকৃতি ওই দ্রব্যটির ব্যক্তিগত চাহিদার সম্মিলন থেকেই নির্ধারিত হয়। কাজেই ব্যষ্টিগত অর্থনীতির তত্ত্ব এক্ষেত্রে ব্যক্তিগত চাহিদা থেকে বাজার-চাহিদা নিরূপণে সহায়তা করে।

(খ) **বিভিন্ন দ্রব্যের যোগানের প্রকৃতি নির্ধারণ ঃ** ব্যষ্টিগত অর্থনীতির তত্ত্বের সাহায্যে আমরা বিভিন্ন দ্রব্যের ব্যক্তিগত যোগান তালিকা (Supply schedule) নির্ধারণ করতে পারি। অর্থাৎ কোনো যোগানদাতা কোনো দ্রব্যের সম্ভাব্য বিভিন্ন দামে যে বিভিন্ন পরিমাণ যোগান দিতে আগ্রহী সেই সম্পর্কটি নির্ধারণ করা যায়। এইভাবে বিভিন্ন যোগানদাতার ব্যক্তিগত যোগান তালিকা থেকে কোনো দ্রব্যের বাজার-যোগান নিরূপণ করা সম্ভব হয়।

(গ) **বিভিন্ন দ্রব্য ও সেবাকর্মের দাম-নির্ধারণ প্রক্রিয়া ঃ** প্রতিযোগিতামূলক বাজারে যে কোনো দ্রব্য বা সেবাকর্মের বাজারদাম ঐ দ্রব্য বা সেবাকর্মের সামগ্রিক চাহিদা ও যোগানের উপর নির্ভর করে। আমরা ইতিপূর্বেই উল্লেখ করেছি যে, কোনো দ্রব্যের সামগ্রিক চাহিদা যদি যোগানের পরিমাণের তুলনায় অধিক হয়, তবে দ্রব্যটির বাজারদাম বৃদ্ধি পায়। ব্যষ্টিগত অর্থনৈতিক তত্ত্বের সাহায্যে যেহেতু বিভিন্ন দ্রব্য ও সেবাকর্মের সামগ্রিক চাহিদা ও সামগ্রিক যোগান নির্ধারণ সম্ভব, সেহেতু এই তত্ত্বের সহায়তায় বিভিন্ন দ্রব্যের বাজারে বাজারদাম নির্ধারণ পদ্ধতি ব্যাখ্যা করা সম্ভব।

(ঘ) **বিভিন্ন উৎপাদনের ক্ষেত্রে উপাদান বণ্টন ঃ** ব্যষ্টিগত অর্থনৈতিক তত্ত্বের সাহায্যে বিভিন্ন দ্রব্য ও উপাদানের বাজারদাম নির্ধারণ পদ্ধতি ব্যাখ্যা সম্ভব। কাজেই উৎপাদকের পক্ষে একদিকে দ্রব্যমূল্য এবং অন্যদিকে নির্দিষ্ট উপাদান মূল্যের

পরিপ্রেক্ষিতে উৎপাদনের উপকরণসমূহ কোন দ্রব্য উৎপাদনের কাজে নিযুক্ত করা উচিত সে বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ সম্ভব হয়। কাজেই এই তত্ত্বের সাহায্যে বিভিন্ন উৎপাদনের ক্ষেত্রে উপাদানের কাম্য নিয়োগের পরিমাণ নির্ধারণ পদ্ধতি ব্যাখ্যা করা যায়।

(ঙ) **ব্যক্তিগত ভোগ ও উৎপাদন সংক্রান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ ঃ** কোনো ভোক্তা তার নির্দিষ্ট আয় এবং ভোগ্যদ্রব্যসমূহের নির্দিষ্ট দামের পরিপ্রেক্ষিতে কি পরিমাণ দ্রব্য ভোগ করলে সর্বোচ্চ সন্তুষ্ট উপযোগ লাভ করতে পারে, ব্যষ্টিগত অর্থনৈতিক তত্ত্বের সাহায্যে তার ব্যাখ্যা প্রদান করা সম্ভব। অন্যদিকে কোনো উৎপাদক তার নির্দিষ্ট বিনিয়োগযোগ্য অর্থ ও উপাদানমূল্যের পরিপ্রেক্ষিতে কি পরিমাণ উপাদান নিয়োগ করলে সর্বাধিক সম্ভব উৎপাদন করতে পারে, ব্যষ্টিগত অর্থনৈতিক তত্ত্বের সাহায্যে সে ব্যাখ্যাও প্রদান করা যায়।

১.৭.২. ব্যষ্টিগত অর্থনৈতিক তত্ত্বের সীমাবদ্ধতা (Limitations of Microeconomic theory)

ভোক্তা ও উদ্যোক্তাদের আচরণ ব্যাখ্যার ক্ষেত্রে ব্যষ্টিগত অর্থনীতির ভূমিকা যথেষ্ট হলেও, এই তত্ত্বের কিছু সীমাবদ্ধতা রয়েছে।

(ক) **জাতীয় আয় নির্ধারণ পদ্ধতি ব্যাখ্যায় অসুবিধা ঃ** একটি নির্দিষ্ট সময়ে কোনো দেশে বিভিন্ন আয় উপার্জনকারী এককগুলির উপার্জিত আয়ের যোগফলে জাতীয় আয় নির্ধারিত হয়। কিন্তু ব্যষ্টিগত অর্থনৈতিক তত্ত্বের সাহায্যে এই জাতীয় আয় বা জাতীয় উৎপাদনমূল্য নিরূপণ পদ্ধতি ব্যাখ্যা করা যায় না।

(খ) **বাণিজ্যচক্রের বিশ্লেষণে অসুবিধা ঃ** নির্দিষ্ট সময় অন্তর কোনো অর্থব্যবস্থায় সামগ্রিক উৎপাদন, আয়, বিনিয়োগ, কর্মনিয়োগ ইত্যাদি বিষয়ে ঊর্ধ্বগতি ও নিম্নগতির যে চক্রাকার আবর্তন দেখা যায়, তাকেই **বাণিজ্যচক্র** (Business cycle) বলে। কিন্তু ব্যষ্টিগত অর্থনৈতিক তত্ত্বের সাহায্যে এই বাণিজ্যচক্রের গতি-প্রকৃতি ব্যাখ্যা করা যায় না।

(গ) **সরকারের আর্থিক ও আয়-ব্যয় নীতি বিশ্লেষণে অসুবিধা ঃ** কোনো অর্থব্যবস্থায় অর্থের সামগ্রিক যোগান নিয়ন্ত্রণের জন্য সরকার আর্থিক নীতি (Monetary policy) গ্রহণ করে। অন্যদিকে সামগ্রিক অর্থনীতির ক্ষেত্রে সরকারি রাজস্ব আয় ও ব্যয় নির্ধারণের জন্য আয়-ব্যয় নীতি (Fiscal policy) গ্রহণ করা হয়। কিন্তু ব্যষ্টিগত অর্থনৈতিক তত্ত্বের সাহায্যে সরকারি আর্থিক নীতি ও আয়-ব্যয় নীতি বিশ্লেষণ করা সম্ভব হয় না।

১.৭.৩. সমষ্টিগত অর্থনীতি (Macroeconomics)

অর্থনীতির যে শাখা কোনো দেশের সামগ্রিক অর্থনৈতিক ক্রিয়াকলাপসমূহ (যেমন, জাতীয় আয় ও উৎপাদন, জাতীয় ভোগ ও বিনিয়োগ ব্যয়, জাতীয় সঞ্চয় ইত্যাদি) বিশ্লেষণ করে, তাকেই **সমষ্টিগত অর্থনীতি** বলা হয়। অর্থাৎ, সমষ্টিগত অর্থনৈতিক তত্ত্বে আমরা ব্যক্তিগত আয় ও ভোগব্যয়ের বদলে জাতীয় আয় ও সামগ্রিক ভোগব্যয়ের গতি-প্রকৃতি বিশ্লেষণ করি। অন্যদিকে এক্ষেত্রে বিশেষ কোনো উৎপাদন প্রতিষ্ঠানের উৎপাদন ও বিনিয়োগ পরিকল্পনার বদলে জাতীয় উৎপাদন ও সামগ্রিক বিনিয়োগ ব্যয়ের গতি-প্রকৃতি বিশ্লেষণ করা হয়।

১.৭.৪. সমষ্টিগত অর্থনীতির প্রয়োজনীয়তা (Usefulness of Macroeconomics)

কোনো অর্থনৈতিক ব্যবস্থার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশের কার্যকলাপ বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে যেমন ব্যষ্টিগত অর্থনৈতিক তত্ত্ব প্রয়োজনীয়, তেমনভাবে সমগ্র অর্থনীতিতে বিভিন্ন সামগ্রিক অর্থনৈতিক চলকের (Macroeconomic variables) গতি-প্রকৃতি বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে সমষ্টিগত অর্থনৈতিক তত্ত্ব একান্ত প্রয়োজন।

(ক) **জাতীয় আয় ও কর্মনিয়োগের স্তর নির্ণয় ঃ** কোনো দেশে নির্দিষ্ট সময়ে জাতীয় আয় এবং কর্মনিয়োগের স্তর পরিমাপের জন্য সমষ্টিগত অর্থনৈতিক তত্ত্ব অত্যন্ত প্রয়োজন। কি পদ্ধতিতে অর্থনীতির বিভিন্ন ক্ষেত্রে উৎপন্ন দ্রব্য সেবাকর্মসমূহের মূল্য পরিমাপের মাধ্যমে জাতীয় উৎপাদন ও আয় নির্ধারণ করা যায়, সমষ্টিগত অর্থনৈতিক তত্ত্ব সেই পদ্ধতি বিশ্লেষণ করে।

(খ) **বাণিজ্যচক্র বিশ্লেষণ ঃ** বাণিজ্যচক্রের ধারণাটি আমরা ইতিমধ্যেই ব্যাখ্যা করেছি। সমষ্টিগত অর্থনৈতিক তত্ত্বের সাহায্যে এই বাণিজ্যচক্রের গতি-প্রকৃতি অথবা অর্থনৈতিক মন্দা ও সমৃদ্ধির অবস্থা বিশ্লেষণ করা সম্ভব। অর্থাৎ সাধারণ মূল্যস্তরের উত্থান ও পতনের বিষয়টি ব্যাখ্যা করা সম্ভব।

(গ) **কোনো দেশের বৈদেশিক লেনদেন হিসাবের বিশ্লেষণ ঃ** একটি দেশে নির্দিষ্ট সময়ে আমদানি এবং রপ্তানি বাণিজ্যের মাধ্যমে সৃষ্ট বৈদেশিক লেনদেনের হিসাব বিশ্লেষণের ক্ষেত্রেও সমষ্টিগত অর্থনৈতিক তত্ত্ব অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। অর্থাৎ এই

হিসাবে কি কারণে প্রতিকূল বা অনুকূল অবস্থার উদ্ভব হয়, প্রতিকূল অবস্থা দূর করার জন্য কি ধরনের পদক্ষেপ গ্রহণ করা দরকার ইত্যাদি বিষয় বিশ্লেষণ করার জন্য সমষ্টিগত অর্থনৈতিক তত্ত্বের প্রয়োজনীয়তা রয়েছে।

(ঘ) **বিভিন্ন বাজারের মধ্যে নির্ভরশীলতার সম্পর্ক বিশ্লেষণ ঃ** অর্থনীতিতে বিভিন্ন দ্রব্যের বাজার, শ্রমের বাজার, অর্থের বাজার ইত্যাদির মধ্যে যে যোগসূত্র রয়েছে সেই বিষয়টি সমষ্টিগত অর্থনৈতিক তত্ত্বের সাহায্যে বিশ্লেষণ করা যায়। যেমন সুদের হার হ্রাস পেলে সামগ্রিক বিনিয়োগ বৃদ্ধির প্রবণতা থাকে এবং দ্রব্যের বাজারে উৎপাদন ও আয় বৃদ্ধি পায়। আবার এই আয় বৃদ্ধির ফলে অর্থের বাজারে লেনদেনের জন্য অর্থের চাহিদা বৃদ্ধি পাবে।

উপরের আলোচনা থেকে বোঝা গেল যে ব্যষ্টিগত ও সমষ্টিগত অর্থনীতি একে অপরের পরিপূরক। ব্যষ্টিগত অর্থনৈতিক তত্ত্বসমূহ অর্থনৈতিক কার্যকলাপের যে অংশের বিশ্লেষণে অসমর্থ, সমষ্টিগত অর্থনীতির মাধ্যমে সেই অপূর্ণতা পূরণ করা সম্ভব হয়। আবার সমষ্টিগত অর্থনীতির দৃষ্টিকোণ থেকে কোনো সমষ্টিগত অর্থনৈতিক নীতি গৃহীত হলে অর্থনীতিতে ক্ষুদ্র অর্থনৈতিক একক (যেমন, ভোক্তা, উদ্যোক্তা ইত্যাদি) কিভাবে প্রভাবিত হয় সেই বিষয়ে বিশ্লেষণের জন্য ব্যষ্টিগত অর্থনীতির চর্চা প্রয়োজন। এই কারণে অর্থনীতিবিদ পল্ স্যামুয়েলসন (Paul Samuelson) মনে করেন 'ব্যষ্টিগত ও সমষ্টিগত অর্থনীতির মধ্যে বাস্তবিকই কোনো বিরোধ নেই। উভয়ই অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। যদি তুমি এর একটি শাখা সম্বন্ধে জ্ঞান লাভ কর অথচ অন্য শাখাটি সম্বন্ধে অজ্ঞ থাক, তবে তুমি অর্ধশিক্ষিতের চেয়েও কম শিক্ষিত' ('There is really no opposition between micro and macroeconomics. Both are vital. You are less than half-educated if you understand one while being ignorant of the other.')।

১.৮. কয়েকটি মৌলিক ধারণা (Some basic concepts)

অর্থনীতির মূল বিষয়বস্তুতে প্রবেশের আগে কয়েকটি মৌলিক বিষয় সম্পর্কে ধারণা থাকা প্রয়োজন। যেমন — উপযোগ, মূল্য, দাম, সম্পদ ইত্যাদি। দ্রব্যের যে ক্ষমতা বা গুণ মানুষের অভাবকে তৃপ্ত করতে সক্ষম, তাকেই বলা যায় দ্রব্যটির উপযোগ। উপযোগ নানাভাবে সৃষ্ট হতে পারে। কোনো অর্থনৈতিক দ্রব্যের এক একক পেতে হলে তার পরিবর্তে অন্য কোনো দ্রব্য যে পরিমাণ প্রদান করা দরকার, তাকেই প্রথমোক্ত দ্রব্যটির মূল্য বলা হয়। এই প্রসঙ্গে কোনো দ্রব্যের ব্যবহারিক মূল্য ও বিনিময়-মূল্যের ধারণা গুরুত্বপূর্ণ। মূল্য এবং দামের ধারণাতেও পার্থক্য রয়েছে। দ্রব্যের কয়েকটি বৈশিষ্ট্যের পরিপ্রেক্ষিতে সেই দ্রব্যটি অর্থনীতিতে সম্পদ হিসাবে গণ্য হয়। সম্পদের সাথে আয় এবং অর্থনৈতিক কল্যাণের ধারণাটি সম্পর্কযুক্ত। কোনো ব্যক্তির ভোগব্যয় নির্ভর করে আয়ের উপর। এই প্রসঙ্গে প্রান্তিক ও গড় ভোগপ্রবণতার ধারণা গুরুত্বপূর্ণ। মানুষের ব্যবহার্য বিভিন্ন দ্রব্যের উপযোগ থেকেই সেই দ্রব্যগুলি কাছে পাওয়ার আকাঙ্ক্ষা জন্মায়। একেই অভাব বলা যায়। সুতরাং অভাবের শ্রেণিবিন্যাস ও বৈশিষ্ট্যগুলির পর্যালোচনা করা প্রয়োজন।

১.৮.১. উপযোগ (Utility)

অর্থবিদ্যায় 'উপযোগ' বলতে কোনো দ্রব্যের এমন ক্ষমতা বা গুণকে নির্দেশ করা হয়, যা মানুষের অভাব তৃপ্ত করতে পারে। অর্থাৎ, উপযোগ হল কোনো দ্রব্যের অভাব পূরণের ক্ষমতা। এক্ষেত্রে **বস্তুগত দ্রব্য** (Material goods) এবং **অবস্তুগত দ্রব্য বা সেবাদ্রব্য** (Non-material goods or Services) উভয়ের কথাই উল্লেখ করা হয়। যেমন — চেয়ার, টেবিল, গাড়ি, বাড়ি ইত্যাদি বস্তুগত দ্রব্যসমূহ মানুষের বিভিন্ন অভাব পরিপূরণের ক্ষমতা রাখে। ফলে মানুষের কাছে ঐ বস্তুদ্রব্যসমূহের উপযোগিতার সৃষ্টি হয়। অন্যদিকে, চিকিৎসকের সেবা, প্রকৌশলীর সেবা, আইনজ্ঞের সেবা ইত্যাদি অবস্তুগত বা সেবাদ্রব্যগুলিও মানুষের অভাবকে তৃপ্ত করে।

● **উপযোগের বৈশিষ্ট্যসমূহ ঃ** উপযোগের মূল বৈশিষ্ট্যগুলি নিম্নরূপ—

(ক) **উপযোগের কোনো বাস্তব অস্তিত্ব নেই ঃ** কোনো ব্যক্তির কাছে কোন দ্রব্য বা সেবার উপযোগ স্বল্প অথবা অধিক হবে সেটি সম্পূর্ণ মানসিক ব্যাপার। অর্থাৎ, উপযোগের কোনো বাস্তব অস্তিত্ব নেই। এটি সম্পূর্ণ কল্পিত বা মানসিক বিষয়। যেমন — কোনো ব্যক্তি খুব বেশি ধূমপান করেন। ফলে তাঁর কাছে 'সিগারেটের' উপযোগ সৃষ্ট হয়। অথচ তিনিই যখন ধূমপান ত্যাগ করবেন, তখন তাঁর কাছে 'সিগারেটের' কোনো উপযোগ থাকবে না।

(খ) **উপযোগ আপেক্ষিক বিষয় ঃ** উপযোগ যেহেতু একটি মনোগত ধারণা, কাজেই একই দ্রব্যের উপযোগ বিভিন্ন ব্যক্তির কাছে ভিন্ন ভিন্ন হতে পারে। আবার, একই ব্যক্তির কাছে একই দ্রব্যের উপযোগ এক-এক সময়ে এক-এক রকম হতে পারে।

(গ) **উপযোগের সাথে নীতিবোধের সম্পর্ক নেই ঃ** অতিরিক্ত মাদকদ্রব্য গ্রহণ সামাজিক কল্যাণসাধন করে না। কিন্তু মদাপ ব্যক্তির কাছে মদের উপযোগের সাথে কোনো নৈতিকতার প্রশ্ন জড়িত থাকে না।

(ঘ) **উপযোগ ও সন্তোষ বা তৃপ্তির ধারণা এক নয় ঃ** কোনো ব্যক্তি কোনো দ্রব্য ব্যবহার করে যে তৃপ্তি পাবে বলে আশা করে, তাকেই **উপযোগ** বলা হয়। অন্যদিকে, দ্রব্যটি ক্রয় করে ভোগ করার পর বাস্তবে সে যে তৃপ্তিলাভ করে তা-ই হল সন্তোষ।

(ঙ) **উপযোগ ও ব্যবহারিক উপযোগিতার ধারণা এক নয় ঃ** স্বাস্থ্যের পক্ষে চরম ক্ষতিকর 'ড্রাগের' (যেমন — হেরোইন, ব্রাউন সুগার ইত্যাদি) কোনো ব্যবহারিক উপযোগিতা নেই। কিন্তু নেশাসক্ত ব্যক্তির কাছে সেগুলির উপযোগ রয়েছে।

(চ) **উপযোগের প্রত্যক্ষ পরিমাপ সম্ভব নয় ঃ** উপযোগ একটি মানসিক ধারণা বলেই এর সরাসরি পরিমাপ করা সম্ভব নয়। অবশ্য কোনো দ্রব্য ভোগ করার জন্য ভোক্তা যে দাম দিতে রাজী থাকে তার মাধ্যমে পরোক্ষভাবে ভোক্তার উপযোগের পরিমাপ করা সম্ভব হতে পারে।

● **উপযোগ সৃষ্টি ঃ** নানাভাবে উপযোগ সৃষ্ট হয়। অর্থনীতিতে বিনিময়ের মাধ্যমে উপযোগ সৃষ্টির প্রক্রিয়াকে **উৎপাদন** বলা হয় (Production is creation of utility through exchange)। অবশ্য বিনিময়ের উদ্দেশ্য কোনো বস্তুর এক অবস্থা থেকে অন্য অবস্থায় রূপান্তরকেও **উৎপাদন** বলা হয়। উপযোগ সৃষ্টির এই প্রক্রিয়াকে প্রধানত চারটি ভাগে ভাগ করা যায় ঃ (১) রূপগত উপযোগ সৃষ্টি, (২) স্থানগত উপযোগ সৃষ্টি, (৩) কালগত উপযোগ সৃষ্টি এবং (৪) সেবাগত উপযোগ সৃষ্টি।

(১) **রূপগত উপযোগ সৃষ্টি ঃ** কোনো বস্তুর রূপ বা আকারগত পরিবর্তনের মাধ্যমে বস্তুটির উপযোগ সৃষ্ট হতে পারে। যেমন — গাছের গুঁড়ি চেরাই করে পাওয়া কাঠ এবং সেই কাঠের তক্তা দিয়ে বানানো আসবাবপত্রের উপযোগকে **রূপগত বা আকারগত উপযোগ** (Form utility) বলে।

(২) **স্থানগত উপযোগ সৃষ্টি ঃ** বিভিন্ন বস্তু স্থানান্তরের মাধ্যমেও উপযোগের সৃষ্টি হয়। যেমন — পাঞ্জাবে উৎপাদিত গম যখন পরিবহন ব্যবস্থার মাধ্যমে ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে স্থানান্তরিত হয়, তখন **স্থানগত উপযোগ** (Place utility) সৃষ্ট হয়।

(৩) **কালগত উপযোগ সৃষ্টি ঃ** বছরের বিশেষ মরশুমে উৎপাদিত শস্যকে যদি গুদামজাত করে রাখা হয় এবং যদি শুখা মরশুমে সেই শস্য স্বল্পমূল্যে সাধারণ মানুষের মধ্যে বণ্টন করা হয়, তবে **কালগত উপযোগ** (Time utility) সৃষ্ট হয়।

(৪) **সেবাগত উপযোগ সৃষ্টি ঃ** বিভিন্ন ব্যাংক ও বিমা প্রতিষ্ঠানের সেবা, পরিবহণ সংস্থা ও পর্যটন সংস্থার সেবা, শিক্ষকের সেবা, চিকিৎসকের সেবা ইত্যাদিও সাধারণ মানুষ ও বিভিন্ন সংস্থার নানা প্রয়োজন মেটায়। এই ধরনের সেবার জন্যও উপযোগ সৃষ্টি হয়। একে **সেবাগত উপযোগ** (Service utility) বলা হয়।

১.৮.২. মূল্য (Value)

সাধারণভাবে মূল্য শব্দটির অর্থ হল গুরুত্ব (Importance)। তবে অর্থবিদ্যায় মূল্য শব্দটি ভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হয়। কোনো অর্থনৈতিক দ্রব্যের এক একক পেতে হলে তার জন্য অন্য দ্রব্য যতটুকু প্রদান করা প্রয়োজন, তাকেই প্রথমোক্ত দ্রব্যটির মূল্য বলা হয়। অর্থবিদ্যায় উৎপাদন এবং উপাদান-মূল্যের ধারণা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

অর্থবিদ্যায় দ্রব্যের মূল্য দু-ভাবে প্রকাশ করা হয়, যথা — (১) **দ্রব্যের ব্যবহারিক মূল্য** (Use value) এবং (২) **বিনিময়-মূল্য** (Exchange value)।

যে দ্রব্য ব্যবহারে অভাব যত অধিক পরিপূরণ হবে, তার ব্যবহারিক মূল্যও তত বেশি হবে। কাজেই, যে দ্রব্যের উপযোগ যত বেশি, তার ব্যবহারিক মূল্যও তত বেশি। অর্থনীতিবিদ্ অ্যাডাম স্মিথ জল এবং হীরের মূল্যের মধ্যে তুলনা করেছিলেন। জলের ব্যবহারিক মূল্য হীরের তুলনায় অনেক বেশি, কারণ মানুষের কাছে জলের উপযোগ অতুলনীয়। অন্যদিকে, একটি হীরকখণ্ডের বিনিময়-মূল্য জলের মূল্যের তুলনায় অনেক বেশি, কারণ হীরকখণ্ডটির বিনিময়ে অন্যান্য দ্রব্য প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়। কাজেই, বিনিময়-মূল্য বলতে বিভিন্ন পণ্যের বিনিময়-হারকেই বোঝানো হয়। দুটি দ্রব্যের মধ্যে যে-কোনো একটি দ্রব্যের পরিপ্রেক্ষিতে অপর দ্রব্যের বিনিময়-মূল্য প্রকাশ করা যায়। যেমন —

10 কেজি. চাল = 20 কেজি. গম

$\therefore$ 1 কেজি. চাল = $^{20}/_{10} = 2$ কেজি. গম

= চালের বিনিময়-মূল্য।

∴ 1 কেজি. গম = $^{10}/_{20}$ = 0·5 কেজি. চাল

= গমের বিনিময়-মূল্য।

কাজেই, বিনিময়-মূল্য হল একটি দ্বি-পার্শ্বিক বিষয়। তাছাড়া বিনিময়ের সম্ভাবনার উপরেই কোনো দ্রব্যের বিনিময়-মূল্য নির্ভর করে।

● দ্রব্যের ব্যবহারিক মূল্য ও বিনিময়-মূল্যের মধ্যে পার্থক্য ঃ

(১) ব্যবহারিক মূল্য বলতে ব্যবহারের ক্ষেত্রে দ্রব্যের গুরুত্বকে বোঝানো হয়। অন্যদিকে, বিনিময়-মূল্য দ্রব্য ক্রয়-বিক্রয়ের ক্ষেত্রে দুটি দ্রব্যের পারস্পরিক গুরুত্ব নির্দেশ করে।

(২) দুটি দ্রব্যের বিনিময়-সম্ভাবনার উপরেই তাদের বিনিময়-মূল্য নির্ভর করে। কিন্তু কোনো দ্রব্যের ব্যবহারিক মূল্য তার বিনিময়-সম্ভাবনার উপর নির্ভর করে না।

(৩) দুটি দ্রব্যের ব্যবহারিক মূল্য একই সাথে বৃদ্ধি পেতে পারে। কিন্তু দুটি দ্রব্যের বিনিময়-মূল্য একই সাথে বৃদ্ধি পায় না। ধরা যাক, চালের বিনিময়-মূল্য, 1 কেজি. চাল = 2 কেজি. গম থেকে বৃদ্ধি পেয়ে 1 কেজি. চাল = 3 কেজি. গম হল। এর ফলে গমের বিনিময়-মূল্য 1 কেজি. গম = $^1/_2$ কেজি. চাল থেকে হ্রাস পেয়ে 1 কেজি. গম = $^1/_3$ কেজি. চাল হবে।

(৪) ব্যবহারিক মূল্য হল একটি একতরফা বিষয়। কিন্তু বিনিময়-মূল্য হল দুই-তরফা বা দ্বি-পার্শ্বিক বিষয়। কারণ দুটি দ্রব্য না হলে একটির পরিপ্রেক্ষিতে অপরটির বিনিময়-মূল্য প্রকাশ করা যায় না।

(৫) অবাধলভ্য দ্রব্যের (Free goods) যোগান, চাহিদার তুলনায় যথেষ্ট হওয়ার ফলে তাদের বিনিময়-মূল্য থাকে না। কিন্তু তাদের ব্যবহারিক মূল্য থাকে (যেমন — প্রাকৃতিক আলো, বাতাস ইত্যাদি)। যে দ্রব্যগুলির যোগান তাদের চাহিদার তুলনায় স্বল্প এবং যেগুলি অর্থের বিনিময়ে লেনদেন হয়, সেগুলিকে **অর্থনৈতিক দ্রব্য** (Economic goods) বলা হয়। এই দ্রব্যগুলির বিনিময়-মূল্য এবং ব্যবহারিক মূল্য উভয়ের অস্তিত্ব থাকে।

১.৮.৩. দাম (Price)

বিনিময়-মূল্যকে যদি অর্থের হিসাবে প্রকাশ করা হয়, তবে তাকে বলা হয় **দাম**। অথবা, বলা যায়, কোনো দ্রব্য-বিক্রেতার বিক্রয়যোগ্য দ্রব্যের সাথে ক্রেতার অর্থের যে বিনিময় হয়, অর্থাৎ প্রতি এক একক দ্রব্যের বিনিময়ে যে পরিমাণ অর্থ প্রদান করতে হয়, তাকেই দ্রব্যটির দাম বলা হয়। কাজেই, দাম হল দ্রব্যের আর্থিক মূল্য। যেমন — 1 কেজি. চাল = 13 টাকা, 1 কেজি. গম = 6 টাকা ইত্যাদি। কাজেই, কোনো পণ্যের এক একক ক্রয় করার জন্য যে অর্থ প্রদান করতে হয়, তাকেই পণ্যটির **দাম** বলা হয়। অন্যদিকে, দুটি পণ্যের বিনিময়-হারকেই মূল্য বলা হয়। একটি দ্রব্যের পরিপ্রেক্ষিতে অপর দ্রব্যের মূল্য বা বিনিময়-মূল্য প্রকাশ করা হয়। যেমন—

10 কেজি. চাল = 20 কেজি. গম

∴ 1 কেজি. চাল = $^{20}/_{10}$ = 2 কেজি. গম,

অর্থাৎ, 1 কেজি. গম = $^1/_2$ কেজি. চাল।

● মূল্য ও দামের মধ্যে পার্থক্য ঃ

(১) একটি দ্রব্যের দাম অর্থের মাধ্যমে প্রকাশ করা হয়। কিন্তু একটি দ্রব্যের মূল্য অপর দ্রব্যের পরিপ্রেক্ষিতে প্রকাশ করা হয়।

(২) মূল্য বলতে দুটি পণ্যের বিনিময়-হারকে নির্দেশ করা হয়। কিন্তু দাম বলতে একটি পণ্যের সাথে অর্থের বিনিময়-হার নির্দেশ করা হয়।

(৩) যদি দুটি দ্রব্য থাকে, তবে আমরা দুটি বিনিময়-মূল্য পাই (1 কেজি. চাল = 2 কেজি. গম এবং 1 কেজি. গম = $^1/_2$ কেজি. চাল)। কিন্তু দ্রব্যের দামের ক্ষেত্রে আমরা কেবল অর্থের মাধ্যমে এক একক দ্রব্যের দাম প্রকাশ করতে পারি।

(৪) একটি দ্রব্যের দাম এবং মূল্য দুই-ই থাকতে পারে। যেমন — গমের পরিপ্রেক্ষিতে চালের মূল্য নির্ধারণ করা যায়। আবার, চালের দামও নির্ধারণ করা যায়। কিন্তু এক টাকার দাম বা টাকার হিসাবে বিনিময়-মূল্য সর্বদাই এক টাকা। তবে, এক টাকার মূল্য = এক টাকার ক্রয়-ক্ষমতা = এক টাকার বিনিময়ে প্রাপ্ত দ্রব্য ও সেবা।

(৫) সকল পণ্যের দাম একই সাথে বাড়তে বা কমতে পারে। কিন্তু সকল পণ্যের মূল্য বা বিনিময়-মূল্য একই সাথে বাড়তে বা কমতে পারে না।

১.৮.৪. সম্পদ (Wealth)

সাধারণভাবে আমরা টাকা-কড়ি, ধন-দৌলত ইত্যাদি বিষয়কেই সম্পদ বলে মনে করি। কিন্তু অর্থবিদ্যায় সম্পদ বলতে এমন সকল অর্থনৈতিক দ্রব্যের ভাণ্ডারকে বোঝায় যেগুলি থেকে নিয়মিতভাবে আয়-প্রবাহ সৃষ্ট হয়। যেমন — আইসক্রীম উৎপাদনকারী যন্ত্রটি হল সম্পদ। কারণ উৎপাদক এই যন্ত্র ব্যবহারের মাধ্যমে নিয়মিত আয়-প্রবাহ সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়। কৃষকের কাছে চাষযোগ্য জমি হল সম্পদ, কারণ সেই জমিতে চাষাবাদ করে নিয়মিত আয়-প্রবাহ সৃষ্টি করা যায়।

● **বৈশিষ্ট্যসমূহ ঃ** কোনো দ্রব্যকে সম্পদ বলে গণ্য করতে হলে তার নিম্নলিখিত চারটি বৈশিষ্ট্য থাকা প্রয়োজন ঃ

(ক) **উপযোগিতার অস্তিত্ব ঃ** যে সকল দ্রব্য মানুষের অভাব পরিপূরণ করে সেগুলিরই উপযোগিতার সৃষ্টি হয়। কাজেই, সম্পদ হিসাবে গণ্য হতে হলে প্রথমেই তাকে উপযোগিতাসম্পন্ন দ্রব্য (বস্তুগত) হতে হবে। যে দ্রব্যের কোনো উপযোগিতা নেই, তা সম্পদ হিসাবে গণ্য হয় না।

(খ) **স্বল্পতা বা অপ্রাচুর্য ঃ** চাহিদার তুলনায় যে সকল দ্রব্যের যোগান যথেষ্ট বেশি (যেমন — প্রাকৃতিক আলো, বাতাস, নদীর জল ইত্যাদি), সেগুলিকে বলা যায় **অবাধ দ্রব্য** (Free goods)। অন্যদিকে, চাহিদার তুলনায় যে সকল দ্রব্যের যোগান স্বল্প, সেগুলিকে বলা হয় **অর্থনৈতিক দ্রব্য** (Economic goods)। এই অর্থনৈতিক দ্রব্যগুলির যোগান তুলনামূলকভাবে কম বলে এগুলি অর্থের বিনিময়ে হস্তান্তরিত হয়। কিন্তু অবাধ দ্রব্যগুলি অর্থের বিনিময়ে হস্তান্তরিত হয় না। কোনো দ্রব্যকে সম্পদ হিসাবে পরিগণিত হতে হলে তাকে অর্থনৈতিক দ্রব্য হতে হবে।

(গ) **হস্তান্তরযোগ্যতা ঃ** যে দ্রব্যগুলির মালিকানার হাতবদল সম্ভব সেগুলিই সম্পদ। অর্থাৎ, কেনাবেচার মাধ্যমে যে দ্রব্যগুলি হস্তান্তরযোগ্য, সেগুলিকেই সম্পদ বলে গণ্য করা হবে। যেমন — জমি কেনাবেচা করা যায় বলে জমি সম্পদ হিসাবে গণ্য হয়। কিন্তু একজনের রেশন কার্ড বা পরীক্ষার পাশ-সার্টিফিকেট অপরকে বিক্রয় করা যায় না। কাজেই, সেগুলি সম্পদ নয়।

(ঘ) **মনের বাইরে অবস্থান বা বহিরাবস্থান ঃ** কোনো দ্রব্যকে সম্পদ হিসাবে গণ্য হতে হলে তাকে মানুষের মনের বাইরে বর্তমান থাকতে হবে। অর্থাৎ, মানুষের অন্তর্নিহিত কবিত্ব শক্তি, সংগীত প্রতিভা ইত্যাদি কখনই সম্পদ হিসাবে গণ্য হয় না।

সুতরাং উপযোগ, স্বল্পতা, হস্তান্তরযোগ্যতা এবং বাহ্যিক অবস্থান — এই চারটি বৈশিষ্ট্য যে দ্রব্যগুলির মধ্যে রয়েছে, সেগুলির মজুত ভাণ্ডার (Stock) হল সম্পদ। কাজেই, **সকল সম্পদই দ্রব্য, কিন্তু সকল দ্রব্য সম্পদ নয়।**

● **সম্পদের শ্রেণিবিভাগ ঃ** সম্পদকে নানা শ্রেণিতে ভাগ করা হয় ঃ

(১) **ব্যক্তিগত সম্পদ ঃ** যে সকল সম্পদের মালিকানা কোনো ব্যক্তি বা পরিবারের হস্তগত থাকে, তাকে বলা হয় ব্যক্তিগত সম্পদ। যেমন — ব্যক্তিগত গাড়ি, বাড়ি, জমি, পুকুর, টাকা-পয়সা, ঋণপত্র বা ডিবেঞ্চার, অংশপত্র বা শেয়ার, ব্যাংক-আমানত ইত্যাদি।

(২) **ব্যবসায়িক সম্পদ ঃ** যে সম্পদগুলি উৎপাদন কাজে ব্যবহৃত হয়, সেগুলিকে বলে ব্যবসায়িক সম্পদ বা কারবারি সম্পদ। যেমন — কারখানা, যন্ত্রপাতি, পরিবহন ও যোগাযোগ ব্যবস্থা, কাঁচামাল ইত্যাদি।

(৩) **সামাজিক ও জাতীয় সম্পদ ঃ** যে সকল সম্পদের মালিকানা কোনো নির্দিষ্ট ব্যক্তি বা গোষ্ঠীবিশেষের হাতে থাকে না, তাকেই সামাজিক সম্পদ বলা যায়। অর্থাৎ, এই সম্পদগুলির ক্ষেত্রে সমাজের সকলের মালিকানা ও ব্যবহারের অধিকার থাকে। যেমন — দেশের রাস্তাঘাট, সরকারি স্কুল, কলেজ, হাসপাতাল, অফিস, রেলপথ, সেচব্যবস্থা, কারখানা, স্বায়ত্তশাসনমূলক প্রতিষ্ঠানের (যেমন — পঞ্চায়েত, মিউনিসিপ্যালিটি, কর্পোরেশন ইত্যাদি) সম্পদ ইত্যাদি হল সামাজিক সম্পদ।

কোনো দেশের ব্যক্তিগত, ব্যবসায়িক ও সামাজিক সম্পদের সমষ্টিকে সাধারণভাবে জাতীয় সম্পদ হিসাবে গণ্য করা যায়। তবে এই সমষ্টির সাথে বিদেশ থেকে সরকারের নিট পাওনা যোগ করতে হয়।

∴ জাতীয় সম্পদ = ব্যক্তিগত সম্পদ + ব্যবসায়িক সম্পদ + সামাজিক সম্পদ + বিদেশ থেকে নিট পাওনা।

উপরিউক্ত শ্রেণিবিভাজন থেকে আমরা ব্যক্তিগত সম্পদ, ব্যবসায়িক সম্পদ, সামাজিক সম্পদ এবং জাতীয় সম্পদের মধ্যে কয়েকটি পার্থক্য নির্দেশ করতে পারি। যেমন —

(ক) ব্যক্তিগত সম্পদের মালিকানা কোনো ব্যক্তি-বিশেষের হাতে থাকে। তবে ব্যবসায়িক সম্পদের মালিকানা কোনো ব্যক্তি, কোনো ব্যবসায়ের অংশীদারগণ বা যৌথ মূলধনী কারবারে শেয়ারহোল্ডারদের হাতে থাকে। অন্যদিকে, সামাজিক সম্পদের মালিকানা কোনো ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর হাতে থাকে না। সমাজের অন্তর্ভুক্ত সকল ব্যক্তিই সামাজিক সম্পত্তির মালিক হিসাবে গণ্য হয়।

(খ) ব্যক্তিগত সম্পদের ব্যবহার ও ভোগের অধিকার কেবল ব্যক্তিমালিকের। অনুরূপভাবে, ব্যবসায়িক সম্পদের ব্যবহার ও ভোগের অধিকারও কোনো ব্যক্তি বা গোষ্ঠী-বিশেষের হাতে কেন্দ্রীভূত থাকে। কিন্তু সামাজিক সম্পদের ব্যবহারের অধিকার সকলেই ভোগ করে।

(গ) ব্যক্তিগত সম্পদ বা ব্যবসায়িক সম্পদের বৃদ্ধির ফলে সামাজিক কল্যাণ বৃদ্ধি নাও পেতে পারে। কারণ এই ধরনের সম্পদ কেবল ব্যক্তি বা গোষ্ঠী-বিশেষের অর্থনৈতিক সুবিধা সৃষ্টির জন্য ব্যবহৃত হয়। তবে সামাজিক সম্পদের বৃদ্ধি সামাজিক কল্যাণের উন্নতিকে সূচিত করে।

(ঘ) ব্যক্তিগত ও ব্যবসায়িক সম্পদ যদি স্বল্পসংখ্যক ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর হাতে কেন্দ্রীভূত থাকে তবে দেশে সম্পদ বণ্টনে বৈষম্যের সৃষ্টি হয়। এই ধরনের বৈষম্য অর্থনৈতিক উন্নয়নের গতিকে বাধা দেয়। কিন্তু সামাজিক সম্পদের বৃদ্ধি এই ধরনের বৈষম্যের সূচনা করে না।

(ঙ) ব্যক্তিগত সম্পদ, ব্যবসায়িক সম্পদ ও সামাজিক সম্পদ — এগুলি জাতীয় সম্পদেরই অঙ্গ। কিন্তু জাতীয় সম্পদ হল উপরিউক্ত সকল প্রকার সম্পদের সমাহার।

১.৮.৫. সম্পদ ও আয় (Wealth and income)

সম্পদ বলতে এমন সব বস্তুগত দ্রব্যকেই নির্দেশ করা হয় যেগুলির উপযোগিতা রয়েছে, যেগুলির যোগান চাহিদার তুলনায় স্বল্প, যেগুলি হস্তান্তরযোগ্য এবং যেগুলির অবস্থান মানুষের মনের বাইরে। কাজেই, সম্পদকে উপযোগিতার একটি ভাণ্ডার (Stock) হিসাবে গণ্য করা যায়। অন্যদিকে, এইসব সম্পদ ব্যবহার করে একটি নির্দিষ্ট সময়কালে (Period of time) বিভিন্ন শ্রেণির মানুষ যে অর্থ বা দ্রব্য-প্রবাহ লাভ করে, তাকেই বলা যায় **আয়**।

যেমন — চাষযোগ্য জমি কৃষকের কাছে সম্পদ। এই সম্পদ ব্যবহার করে প্রতি বছর যে পরিমাণ ফসল উৎপন্ন হয় বা ঐ ফসল বিক্রয় থেকে যে আর্থিক মূল্য লাভ হয়, তাকেই বলা যায় **কৃষকের আয়**। অনুরূপভাবে, একটি কারখানার মালিকের সম্পদ হল যন্ত্রপাতি, কারখানাবাড়ি ইত্যাদি। এই সম্পদ ব্যবহার করেই সে উৎপাদন বা আয় সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়। নির্দিষ্ট পরিমাণ সম্পদ ব্যবহার করে কোনো মানুষ একটি নির্দিষ্ট সময়কালে (প্রতিদিনে, সপ্তাহে, মাসে বা বছরে) যে অর্থ উপার্জন করে, তাকে বলা যায় **আর্থিক আয়** (Money income)। যেমন — একজন শ্রমিকের প্রতি মাসে আয় 800 টাকা। এই আর্থিক আয়ের সাহায্যে কোনো ব্যক্তি যে পরিমাণ দ্রব্য ও সেবা ক্রয় করতে সক্ষম হয়, তাকেই বলা হয় কোনো ব্যক্তির **প্রকৃত বা বাস্তব আয়** (Real income)। অর্থাৎ, আর্থিক আয়ের ক্রয়-ক্ষমতার উপর এই বাস্তব আয় নির্ভর করে। সাধারণত দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি পেলে স্থির আয়শ্রেণিভুক্ত মানুষের প্রকৃত আয় হ্রাস পায়। **সম্পদ এবং আয়ের মধ্যে নিম্নলিখিত পার্থক্যগুলি উল্লেখ করা যায় ঃ**

(১) আয় হল একটি **প্রবাহ ধারণা** (Flow concept)। কিন্তু সম্পদ হল একটি **ভাণ্ডারবাচক ধারণা** (Stock concept)। সম্পদ হল উপযোগিতার ভাণ্ডার এবং আয় হল উপযোগিতার প্রবাহ।

(২) সময়ের একটি নির্দিষ্ট বিন্দুতে (Point of time) সম্পদের পরিমাপ করা হয় (যেমন — 31শে মার্চ, 2004)। অন্যদিকে, একটি নির্দিষ্ট সময়কালে (Period of time) আয়-প্রবাহ পরিমাপ করা হয় (যেমন — প্রতি মাসে আয়)।

(৩) আয়ের একটি অংশের সাহায্যে জমি, যন্ত্রপাতি ইত্যাদি বিভিন্ন সম্পদ ক্রয় করা সম্ভব। অর্থাৎ, আয় থেকে সম্পদ সৃষ্টি সম্ভব। অন্যদিকে, সম্পদ থেকেই আবার আয়-প্রবাহ সৃষ্ট হয়। সম্পদ থেকে একাধিকবার আয়-প্রবাহ সৃষ্টি সম্ভব। যেমন — একটি যন্ত্রকে বার বার ব্যবহার করে অনেক বছর ধরে আয়-প্রবাহ সৃষ্টি করা যায়। কিন্তু আয় যদি সম্পদে পরিণত না হয়, তবে তা থেকে একাধিকবার আয় সৃষ্টি সম্ভব হয় না। যেমন — উৎপাদিত ফসলের একটি অংশ যদি বীজ হিসাবে রাখা না হয় তবে তা থেকে পুনরায় আয় বা উৎপাদন লাভের সুযোগ থাকে না।

(৪) সম্পদের পরিমাণ স্থির থাকলেও আয়-প্রবাহের গতিবেগ (অর্থাৎ,আয়বৃদ্ধির হার) পরিবর্তিত হতে পারে।

১.৮.৬. সম্পদ ও কল্যাণ (Wealth and Welfare)

মানুষের অভাব পরিপূরণে সক্ষম দ্রব্যসামগ্রী ও সেবাকর্মের একটি সমষ্টি বা মজুত ভাণ্ডারই হল **সম্পদ**। এই সকল দ্রব্য ও সেবা ভোগের মধ্য দিয়েই মানুষ তার অনন্ত অভাব পরিপূরণ করতে চায়। এই দ্রব্যসমূহ ভোগ করলে মানুষ বস্তুগত সুখ ও তৃপ্তি অনুভব করে। এইভাবে ব্যক্তিগত ও সামাজিক দিক থেকে যে বস্তুগত সুখ বা তৃপ্তি লাভ করা যায়, তার সামগ্রিক ফলশ্রুতি হল **কল্যাণ** (Welfare)। অর্থনৈতিক তত্ত্বের যে অংশ সামাজিক সম্পদসমূহের দক্ষ ব্যবহারের মাধ্যমে সমাজের বেশির ভাগ মানুষের সামগ্রিক উপযোগ সর্বোচ্চকরণের উপর গুরুত্ব আরোপ করে, তাকেই **কল্যাণমূলক অর্থনীতি** (Welfare economic) বলা হয়। কাজেই, কল্যাণ একটি গুণগত বিষয় বা মানসিক বিষয়। সম্পদ ও কল্যাণের মধ্যে একটি নির্ভরশীলতার সম্পর্ক রয়েছে ঃ

(১) কোনো অর্থব্যবস্থায় জনসাধারণ কি পরিমাণ দ্রব্য ও সেবা ভোগ করতে এবং কি পরিমাণ উপযোগ বা তৃপ্তিলাভে সক্ষম, তা দেশের সম্পদের পরিমাণের উপর নির্ভর করে। কাজেই, কোনো সমাজে অর্থনৈতিক কল্যাণের মূল উপকরণ হল সম্পদের যোগান। সুতরাং, সাধারণভাবে বলা যায় যে, দেশে সম্পদের যোগান বৃদ্ধি পেলে কল্যাণও বৃদ্ধি পায়।

(২) কোনো সমাজব্যবস্থায় কল্যাণ বৃদ্ধি পেলে তা সম্পদ বৃদ্ধিতেও সহায়তা করে। কারণ কল্যাণ বৃদ্ধি পেলে মানুষের কর্মদক্ষতা বৃদ্ধি পায়। ফলে, দেশে উৎপাদনের পরিমাণ বৃদ্ধির সাথে সাথে সম্পদের পরিমাণও বৃদ্ধি পায়। তবে দেশে সম্পদের পরিমাণ বৃদ্ধি পেলে কল্যাণ সৃষ্ট হবে কিনা তা নিশ্চয় করে বলা যায় না।

প্রথমত, সকল ধরনের সম্পদ মানুষের কল্যাণসাধন করে না। স্বাস্থ্যের পক্ষে ক্ষতিকর নেশাদ্রব্যের (যেমন — মদ, গাঁজা, হেরোইন ইত্যাদি) যোগান বৃদ্ধি সম্পদের বৃদ্ধি সূচিত করলেও তা কল্যাণকর নয়। অবশ্য এখানে ভাল-মন্দ বিচারের (Value judgement) দৃষ্টিকোণটি গুরুত্বপূর্ণ। নেশাখোর ব্যক্তিদের দৃষ্টিকোণ থেকে নেশাদ্রব্যের যোগান বৃদ্ধি কল্যাণকর মনে হতে পারে। কিন্তু সামগ্রিক সমাজের দৃষ্টিকোণ থেকে এটি কল্যাণকর নয়। আবার বলা যায়, শিল্পক্ষেত্রের বিকাশ সম্পদ বৃদ্ধিকে সূচিত করে। কিন্তু এর ফলে পরিবেশ-দূষণের মাত্রা যদি অত্যধিক বৃদ্ধি পায়, তবে তা নিশ্চয়ই কল্যাণ সূচিত করে না।

দ্বিতীয়ত, সমাজে যদি সম্পদ বণ্টনে বৈষম্য থাকে তবে সম্পদের পরিমাণ বৃদ্ধি পেলেও কেবল মুষ্টিমেয় কিছু ধনী ব্যক্তির ভোগ-সম্ভাবনাই বৃদ্ধি পায়। বেশির ভাগ মানুষ ভোগ বৃদ্ধির সুযোগ থেকে বঞ্চিত হয়। কাজেই, সেই সকল ক্ষেত্রে সম্পদ বৃদ্ধি পেলেও তা বেশির ভাগ মানুষের কল্যাণ সূচিত করে না। সম্পদ এবং কল্যাণের মধ্যে নিম্নলিখিত পার্থক্যগুলিও লক্ষ্য করা যায় ঃ

(১) সম্পদের পরিমাপ সম্ভব, কিন্তু কল্যাণের কোনো সুনির্দিষ্ট পরিমাপ নেই।

(২) কল্যাণ একটি গুণগত, বিমূর্ত ও মানসিক বিষয়, কিন্তু সম্পদ একটি বস্তুগত বা পরিমাণগত ধারণা।

(৩) সম্পদের পরিমাণ বৃদ্ধি পেলে কল্যাণ বৃদ্ধি পাবে কিনা তার কোনো নিশ্চয়তা নেই।

(৪) কোনো দেশের অর্থনৈতিক কার্যকলাপের মূল উদ্দেশ্য হল কল্যাণের মাত্রা বৃদ্ধি করা এবং এই লক্ষ্য অর্জনের জন্য সম্পদ একটি উপকরণ মাত্র।

● **সম্পদ ও মূলধনের মধ্যে পার্থক্য** (Differences between Wealth and Capital) ঃ **সম্পদ** হল বিভিন্ন দ্রব্য ও সেবার এমন এক মজুত ভাণ্ডার যা থেকে নিয়মিতভাবে আয়-প্রবাহ সৃষ্ট হয়। অন্যদিকে, মানুষেরদ্বারা উৎপাদিত উৎপাদনের উপকরণগুলিকে বলা হয় **মূলধন** (Capital)। যেমন — যন্ত্রপাতি, কাঁচামাল ইত্যাদি মূলধনের অন্তর্গত। এই মূলধনী দ্রব্যসমূহকে **বিনিয়োগ দ্রব্য** (Investment goods) বা **উৎপাদকদের দ্রব্যও** (Producer goods) বলা হয়। কাজেই, মূলধন ও সম্পদের মধ্যে নিম্নলিখিত পার্থক্যগুলি উল্লেখ করা যায় ঃ

(১) সম্পদের মধ্যে ভোগদ্রব্য এবং বিনিয়োগ দ্রব্য উভয়েই অন্তর্ভুক্ত, কিন্তু মূলধনের মধ্যে ভোগ্যদ্রব্য অন্তর্ভুক্ত নয়। কারণ, মূলধন কেবল উৎপাদনের কাজেই ব্যবহৃত হয় এবং মূলধনকে বার বার ব্যবহার করা যায়।

(২) মূলধন মাত্রেই উৎপাদন বৃদ্ধির কাজে সহায়তা করে, কিন্তু সম্পদ হলেই যে তা উৎপাদন বৃদ্ধিতে সহায়ক হবে তার কোন নিশ্চয়তা নেই।

কাজেই বলা যায় যে, সকল মূলধনই সম্পদ, কিন্তু সকল সম্পদ মূলধন নয়।

১.৮.৭. ভোগ ও ভোগপ্রবণতা (Consumption and propensity to consume)

মানুষ জীবনধারণের জন্য এবং অভাব পরিপূরণের জন্য নানা ধরনের দ্রব্য এবং সেবা প্রতিনিয়ত ব্যবহার করে। যেমন — পোশাক-পরিচ্ছদ, বই, খাতা, কলম, চেয়ার, টেবিল, খাট, বিছানা ইত্যাদি বিভিন্ন বস্তুগত দ্রব্য ব্যবহারের মাধ্যমে মানুষের বিভিন্ন অভাব তৃপ্ত হয়। অর্থাৎ, এই সকল দ্রব্য ব্যবহার করে আমরা যে উপযোগ পাই তার মাধ্যমেই আমাদের অভাব তৃপ্ত হয়। প্রতিনিয়ত ব্যবহারের মাধ্যমে একসময় ঐ দ্রব্যের উপযোগ সৃষ্টির ক্ষমতা নিঃশেষ হয়। যেমন — একটি খাতা ব্যবহার করার পর যখন সেখানে লেখার মতো পৃষ্ঠা থাকে না, তখন তার কোনো উপযোগ আমাদের কাছে থাকে না। নানা সেবাদ্রব্যও মানুষের অভাব পূরণ করে। যেমন — শিক্ষা, চিকিৎসা, ভ্রমণ ইত্যাদি পরিষেবাও মানুষকে তৃপ্ত করে। এই সকল দ্রব্য বা সেবা যখন সরাসরি মানুষের অভাব পূরণ করে এবং এগুলি ব্যবহারের মাধ্যমে যখন দ্রব্য বা সেবার উপযোগ ক্রমশ নিঃশেষ হতে থাকে, তখন তাকেই বলা হয় **ভোগ**। কাজেই, বিভিন্ন দ্রব্য ও সেবার ব্যবহারের মাধ্যমে সেগুলির উপযোগ নিঃশেষ করার প্রক্রিয়াটিকেই বলা যায় ভোগ। সুতরাং **ভোগ হল একটি প্রক্রিয়া** (Process)। ভোগের সংজ্ঞা বিশ্লেষণ করলে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি লক্ষ্য করা যায় ঃ

(১) উৎপাদিত দ্রব্যসামগ্রী সরাসরি ব্যবহারের মাধ্যমে অভাব পূরণের কাজই হল ভোগ। এই কারণে যন্ত্রপাতি বা কাঁচামাল ভোগের উপকরণ হতে পারে না, কারণ সেগুলি সরাসরি আমাদের অভাব তৃপ্ত করে না। যন্ত্রপাতি বা কাঁচামাল বিভিন্ন দ্রব্য উৎপাদনে সহায়তা করে এবং সেই দ্রব্যগুলি আমরা ভোগ করি।

(২) দ্রব্য ও সেবার সর্বশেষ ব্যবহার বা চূড়ান্ত ব্যবহারই (Final use) হল ভোগ। যেমন — চামড়ার ব্যাগ তৈরি করার জন্য যে কাঁচামাল প্রয়োজন সেগুলি আমরা সরাসরি ব্যবহার করি না। আমরা ব্যবহার করি সর্বশেষ পর্যায়ে উৎপাদিত দ্রব্যটি।

(৩) ভোগই হল যাবতীয় অর্থনৈতিক ক্রিয়াকলাপের সর্বশেষ উদ্দেশ্য। অথবা, বলা যায় সকল ধরনের অর্থনৈতিক কাজকর্মের পরিসমাপ্তি ঘটে ভোগের মধ্য দিয়ে।

কোনো ব্যক্তি নির্দিষ্ট সময়ে বিভিন্ন দ্রব্য ও সেবা কি পরিমাণ ভোগ করবে তা প্রধানত নির্ভর করে তার আয়ের উপর। আবার বলা যায়, সামাজিক ভোগব্যয় নির্ভর করে জাতীয় আয়ের উপর। ভোগব্যয় (C) এবং আয়ের (Y) মধ্যে এই নির্ভরশীলতার সম্পর্কটিকে বলা হয় **ভোগ-অপেক্ষক** (Consumption function)। $\therefore C = C(Y)$

এক্ষেত্রে অন্যান্য যে সকল বিষয় ভোগব্যয়কে প্রভাবিত করে (যেমন — পরিবারের আয়তন, রুচি ও পছন্দ, ভোগ্যদ্রব্যের দাম, সুদের হার, সম্পত্তির পরিমাণ, আয়-বণ্টন ইত্যাদি) সেগুলি আপাতত অপরিবর্তিত রয়েছে অনুমান করে নেওয়া হয়। এই ক্ষেত্রে আয়ের পরিবর্তনের ফলে ভোগব্যয়ের পরিমাণে যে পরিবর্তন সূচিত হবে, তাকেই **ভোগপ্রবণতা** বলা হয়। এই ভোগপ্রবণতা দু-ধরনের হতে পারে ঃ

(ক) গড় ভোগপ্রবণতা (Average Propensity to Consume বা APC) এবং

(খ) প্রান্তিক ভোগপ্রবণতা (Marginal Propensity to Consume বা MPC)।

মোট আয় (Y) এবং মোট ভোগব্যয়ের (C) অনুপাতকে বলা হয় **গড় ভোগপ্রবণতা**।

$$\therefore APC = \frac{C}{Y}$$

আবার, Y-এর সামান্য পরিবর্তনের ফলে C-এর যে পরিবর্তন হয়, তাকে বলা হয় **প্রান্তিক ভোগপ্রবণতা**।

$$\therefore MPC = \frac{\Delta C}{\Delta Y}$$ যেখানে Δ = পরিবর্তন।

নীচে উদাহরণের সাহায্যে বিষয়টি বোঝানো হল :

আয় (Y)	ভোগব্যয় (C)	গড় ভোগপ্রবণতা (APC)	প্রান্তিক ভোগপ্রবণতা (MPC)
300	270	$\frac{270}{300} = 0{\cdot}9$	—
400	320	$\frac{320}{400} = 0{\cdot}8$	$0{\cdot}5 \left[= \frac{320-270}{400-300}\right]$
500	370	$\frac{370}{500} = 0{\cdot}74$	$0{\cdot}5 \left[= \frac{370-320}{500-400}\right]$
600	420	$\frac{420}{600} = 0{\cdot}7$	$0{\cdot}5 \left[= \frac{420-370}{600-500}\right]$

এখানে দেখা যাচ্ছে যে, আয় (Y) যতই বৃদ্ধি পেয়েছে, গড় ভোগপ্রবণতা (APC) ততই ধীরে ধীরে হ্রাস পেয়েছে। অন্যদিকে, MPC স্থির রয়েছে। অবশ্য Y-বৃদ্ধির সাথে সাথে MPC হ্রাসও পেতে পারে।

● **গড় ও প্রান্তিক ভোগপ্রবণতার পার্থক্য :** APC এবং MPC-এর নিম্নলিখিত পার্থক্য লক্ষ্য করা যায় :

(ক) গড় ভোগপ্রবণতা (APC) প্রতি একক আয় থেকে সম্ভাব্য ভোগব্যয়কে নির্দেশ করে। অন্যদিকে, প্রান্তিক ভোগপ্রবণতা অতিরিক্ত এক একক আয় থেকে উদ্ভূত অতিরিক্ত ভোগব্যয়কে নির্দেশ করে।

(খ) মোট আয়ের কত অংশ ভোগে ব্যয় হয়, সেই বিষয়টি APC-এর মাধ্যমে বোঝা যায়। অন্যদিকে, MPC-এর মাধ্যমে ভোগব্যয়ের পরিবর্তনশীলতার বিষয়টি বোঝা যায়।

(গ) MPC নির্ধারণের জন্য আমাদের দুটি আয়স্তর ও দুটি ভোগব্যয়ের স্তর জানা দরকার। অন্যদিকে, APC নির্ধারণের জন্য একটি আয়স্তর ও সেই আয়স্তরে ভোগব্যয়ের পরিমাণ জানা দরকার।

(ঘ) অধ্যাপক কেইনস্ (Keynes) তাঁর ভোগ-অপেক্ষক আলোচনায় অনুমান করে নিয়েছিলেন যে, আয় বাড়লে ভোগব্যয় বাড়ে ঠিকই, কিন্তু আয়ের বৃদ্ধির তুলনায় ভোগব্যয়ের বৃদ্ধি অপেক্ষাকৃত কম হয়। অর্থাৎ, প্রান্তিক ভোগপ্রবণতার (MPC) মান ধনাত্মক হবে, কিন্তু একক অপেক্ষা কম হবে [$0 < MPC < 1$]। তবে, কোনো আয়ের স্তরে যদি $Y = C$ হয়, তবে $\frac{C}{Y} = APC = 1$ হবে। আবার, $Y > C$ হলে, $\frac{C}{Y} = APC < 1$ এবং $C > Y$ হলে, $\frac{C}{Y} = APC > 1$ হবে।

১.৮.৮. অভাব এবং অভাবের বৈশিষ্ট্য (Wants and Characteristics of Wants)

যেসকল দ্রব্য বা সেবা মানুষের প্রয়োজন মেটায়, সেগুলি তারা পেতে চায়। যে দ্রব্যগুলির উপযোগ রয়েছে সেগুলি যখন কোনো ব্যক্তি লাভ করতে চায়, তখন তার মনে সেগুলি লাভ করার আকাঙ্ক্ষা জন্মায়। এই ধরনের আকাঙ্ক্ষা থেকেই অভাবের উৎপত্তি। কাজেই, অভাব হল মানুষের মনের একটি বিশেষ অনুভূতি।

● **অভাবের বৈশিষ্ট্যসমূহ :** মানুষের অভাবের কিছু বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করা হল :

(১) **মানুষের অভাব অসীম :** মানব-সভ্যতার ক্রমোন্নতির সাথে সাথে মানুষের অভাবের পরিধিও বিস্তৃত হয়েছে। অন্ন-বস্ত্র-বাসস্থান ইত্যাদি প্রাথমিক অভাবগুলি ছাড়াও জীবনধারণের মানোন্নয়নের জন্য মানুষের আরও নানা উপকরণের প্রয়োজন হয়। একটির অভাব পূরণ হলেই আর একটি এসে উপস্থিত হয়। আবার, বিভিন্ন দ্রব্য ও সেবার অভাব চক্রাকারে আবর্তিত হয়। স্বল্প পরিমাণ দ্রব্য ও সেবা উপভোগের তুলনায় মানুষ সর্বদাই অধিক পরিমাণ দ্রব্য ও সেবা উপভোগ পছন্দ করে। কাজেই, মানুষের অভাবের কোনো সীমা নেই। অভাব অনন্ত।

(২) **পরস্পর-প্রতিদ্বন্দ্বী অভাব :** কোনো কোনো অভাব একাধিক দ্রব্য উপভোগের মাধ্যমে পূরণ করা যায় বলে সেই দ্রব্যগুলির অভাব পরস্পর-প্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে ওঠে। যেমন — টেলিভিসনের অভাব বি.পি.এল, ওনিডা, ফিলিপ্স ইত্যাদি যে-কোনো এক

ধরনের টেলিভিসনের মাধ্যমেই পূরণ সম্ভব। কাজেই, এই টেলিভিসনগুলির অভাব পরস্পর-প্রতিদ্বন্দ্বী। আবার, মানুষের আয় সীমাবদ্ধ বলেও সব অভাব একসাথে পূরণ সম্ভব হয় না। যেমন — নির্দিষ্ট অর্থের সাহায্যে বই কেনা হবে, না পোশাক কেনা হবে — এটি বিচার করতে হয় বলেই বই এবং পোশাকের অভাব তখন প্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে ওঠে।

(৩) **নির্দিষ্ট সময়ে প্রতিটি স্বতন্ত্র অভাবের পূরণ সম্ভব ঃ** যদিও অভাবের সীমা নেই, কিন্তু একটি নির্দিষ্ট সময়সীমার মধ্যে মানুষ যখন কোনো দ্রব্য ক্রমশ অধিক পরিমাণে ভোগ করে, তখন একসময় দ্রব্যটির প্রতি তার আর কোনো আকর্ষণ থাকে না। যেমন — সকালে কোনো ব্যক্তি পাঁচ কাপ চা পানের পর আর অধিক চা পান যদি পছন্দ না করে, তবে বুঝতে হবে যে, তার সকালবেলার চায়ের অভাব পূরণ হয়েছে।

(৪) **কিছু অভাব পরস্পর পরিপূরক ঃ** বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে একটি অভাব পরিপূরণের জন্য বিভিন্ন পরিপূরক দ্রব্যের প্রয়োজন হয়। যেমন — গৃহনির্মাণের জন্য ইঁট, বালি, লোহা, সিমেন্ট, পাথরকুচি ইত্যাদি পরিপূরক দ্রব্যের প্রয়োজন হয়। ফলে, গৃহনির্মাণের জন্য একই সাথে এই পরিপূরক অভাবগুলি পূরণ করতে হয়।

(৫) **প্রদর্শন প্রভাবের মাধ্যমে সৃষ্ট অভাব ঃ** আকর্ষণীয় বিজ্ঞাপনে প্রলুব্ধ হয়ে অথবা মানুষের স্বভাবসিদ্ধ অনুকরণপ্রিয়তার জন্যও কিছু কিছু অভাব সৃষ্ট হতে পারে। যেমন — বিজ্ঞাপনে মোহিত হয়ে কোনো ব্যক্তি দামী ফ্রিজ, ওয়াশিং মেসিন ইত্যাদির অভাব বোধ করতে পারে।

(৬) **সামাজিক রীতি-নীতি ও পরিবেশগত প্রভাবের মাধ্যমে সৃষ্ট অভাব ঃ** মানুষ সমাজবদ্ধ জীব। কাজেই, মানুষকে সামাজিক রীতি-নীতি মেনে চলতে হয়। এই কারণেও নানা অভাব সৃষ্ট হয়। যেমন — দুর্গাপূজা, ঈদ, খ্রিস্টমাস ইত্যাদি উৎসবের সময় মানুষের মনে নানা ধরনের ভোগদ্রব্যের অভাব উপস্থিত হয়। আবার, প্রাকৃতিক পরিবেশের বিভিন্নতার দরুনও অভাবের পার্থক্য হতে পারে। যেমন — পাহাড়ী জায়গায় শীতবস্ত্রের অভাব তুলনামূলকভাবে বেশি অনুভূত হয়।

(৭) **অভাব পরিবর্তনশীল ঃ** গতিশীল সমাজব্যবস্থায় মানুষের অভাবও পরিবর্তনশীল। যেমন — বিজ্ঞানের অগ্রগতির ফলে এখন দম-দেওয়া ঘড়ির পরিবর্তে ব্যাটারী-চালিত বা ইলেকট্রনিকস ঘড়ি বাজারে এসেছে। ফলে, মানুষ পুরানো ধরনের ঘড়ির পরিবর্তে নতুন ধরনের ঘড়ির অভাব অনুভব করে। আবার বলা যায়, বয়স বৃদ্ধির সাথে সাথেও একই ব্যক্তির অভাবের ধরন ক্রমশ পাল্টে যায়।

● **অভাবের শ্রেণিবিন্যাস (Classification of Wants) ঃ** মানুষের বিভিন্ন অভাবকে প্রধানত দু-ভাগে ভাগ করা যায়। এই বিভাগগুলি নীচে দেখানো হল ঃ

(ক) মুখ্য অভাব (Primary wants) এবং **(খ) গৌণ অভাব** (Secondary wants)।

মুখ্য অভাব বলতে অতি-প্রয়োজনীয় দ্রব্যের (Necessaries) অভাবকেই বোঝানো হয়। অন্যদিকে, গৌণ অভাব বা অপ্রধান অভাবকে আবার দু-ভাগে ভাগ করা হয় ঃ **(i)** আরামদায়ক দ্রব্যের অভাব (Comforts) এবং **(ii)** বিলাসদ্রব্যের অভাব (Luxuries)।

(1) **অতি-প্রয়োজনীয় দ্রব্যের অভাব ঃ** যে দ্রব্যগুলি মানুষের জীবনধারণের জন্য অপরিহার্য, সেই দ্রব্য ও সেবার অভাবকেই অতি-প্রয়োজনীয় দ্রব্যের অভাব বলা হয়। অর্থাৎ অন্ন, বস্ত্র, বাসস্থান — এই তিনটির অভাবই অতি-প্রয়োজনীয় দ্রব্যের অভাব হিসাবে চিহ্নিত হয়। এই প্রয়োজনীয় অভাবগুলিকে আবার **তিন শ্রেণিতে** ভাগ করা হয় ঃ (i) জীবনধারণের জন্য অত্যন্ত প্রয়োজনীয় দ্রব্যের অভাব, (ii) দক্ষতা সৃষ্টির জন্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যের অভাব এবং (iii) অভ্যাসজনিত প্রয়োজনীয় দ্রব্যের অভাব।

মানুষের অন্ন, বস্ত্র ও বাসস্থানের অভাবই হল জীবনধারণের জন্য একান্ত প্রয়োজনীয় দ্রব্যের অভাব। আবার, মানুষের দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য প্রয়োজন উপযুক্ত শিক্ষা, স্বাস্থ্য, প্রশিক্ষণ ইত্যাদি। এইগুলির চাহিদাই হল দক্ষতা সৃষ্টির জন্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যের অভাব। অন্যদিকে, কোনো কোনো ব্যক্তি বিশেষ দ্রব্য ভোগে অভ্যস্ত হয়ে পড়ে। ফলে, এই অভ্যাসজনিত কারণে দ্রব্যটি তাদের কাছে বিশেষ প্রয়োজনীয় বলে মনে হয়। যেমন — ধূমপায়ীদের কাছে সিগারেট বা তামাকের অভাব।

(2) **আরামদায়ক দ্রব্যের অভাব ঃ** কিছু দ্রব্যভোগের মাধ্যমে মানুষ জীবনে সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য অনুভব করে। যেমন — আরাম-কেদারা, নরম-গদিযুক্ত বিছানা, সুদৃশ্য শয়ন-কক্ষ, বৈদ্যুতিক পাখা, টি.ভি., ফ্রিজ, ওয়াশিং মেশিন ইত্যাদি। ঐ সকল দ্রব্যের প্রয়োজনীয়তাই মানুষের মনে আরামদায়ক দ্রব্যের অভাব সৃষ্টি করে।

(3) **বিলাসদ্রব্যের অভাব ঃ** ধনী ব্যক্তিরা নিজেদের প্রতিপত্তি ও ঐশ্বর্য জাহির করার জন্য বহুমূল্য অলঙ্কার, শীতাতপ-নিয়ন্ত্রিত দামি মোটরগাড়ি, দামি সেলুলার ও মোবাইল টেলিফোন, শীতাতপ-নিয়ন্ত্রিত বাড়ি ইত্যাদির অভাব বোধ করে। এই ধরনের অভাববোধকেই বিলাসদ্রব্যের অভাব বলা হয়।

18

অভাবের উপরি-উক্ত শ্রেণি-বিভাজন অবশ্য কতখানি বাস্তবসম্মত সে বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ রয়েছে। বিভিন্ন শ্রেণির মানুষের আয়, অভ্যাস, পরিবেশ, জীবনধারণ পদ্ধতি ইত্যাদির বিভিন্নতা অনুসারে একই দ্রব্য কোনো মানুষের কাছে অত্যন্ত প্রয়োজনীয় এবং অপর ব্যক্তির কাছে আরামদায়ক বা বিলাসদ্রব্য বলে মনে হতে পারে। যেমন — ডাক্তারের কাছে একটি গাড়ির অভাব যেখানে প্রয়োজনীয় অভাব, সেখানে একজন সাধারণ মানের মানুষের কাছে সেটি হয়তো বিলাসদ্রব্যের অভাব হিসাবেই গণ্য হবে। আবার, একই দ্রব্য যদি প্রয়োজনের অতিরিক্ত ব্যবহার করা হয়, তবে তা বিলাসিতার পর্যায়ে চলে যেতে পারে। যেমন — শাড়ি প্রয়োজনীয় দ্রব্য। কিন্তু কোনো ভদ্রমহিলা যদি তার প্রয়োজনের তুলনায় অনেক বেশি পরিমাণ শাড়ি ক্রয় করতে চান, তবে সেটি শৌখিনতা বা বিলাসিতা বলেই গণ্য হবে। কাজেই, প্রয়োজনীয় দ্রব্য, আরামদায়ক দ্রব্য ও বিলাসদ্রব্য কোনো দ্রব্যের নিজস্ব বৈশিষ্ট্য হতে পারে না। ভোগকারীর দৃষ্টিভঙ্গিই দ্রব্যগুলিকে প্রয়োজনীয় অথবা আরামদায়ক অথবা বিলাসদ্রব্য করে তোলে।

অর্থনীতির মূল সমস্যাসমূহ
(Basic Problem of an Economy)

২.১. ভূমিকা (Introduction)

যে কোনো অর্থনীতিতে সীমিত সম্পদের পরিপ্রেক্ষিতে অর্থনীতির মূল সমস্যাগুলি হল ঃ কি উৎপাদন করা হবে এবং কি পরিমাণে? কিভাবে উৎপাদন করা হবে এবং কাদের জন্য উৎপাদন করা হবে? বাজার অর্থনীতিতে নিয়ন্ত্রণবিহীন দাম ব্যবস্থার মাধ্যমে এই সমস্যাসমূহের সমাধান সম্ভব। তবে রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণবিহীন এই মুক্ত বাজার অর্থব্যবস্থার বেশ কিছু অসুবিধাও আছে। বর্তমানে বিশ্বের বিভিন্ন দেশে মিশ্র অর্থব্যবস্থার প্রাধান্য লক্ষ্য করা যায়। এই অধ্যায়ে আমরা এই বিষয়গুলি আলোচনা করব।

২.২. অর্থব্যবস্থা (Economic system)

যখন কোনো অর্থনীতির বিভিন্ন একক (যেমন — ভোক্তা, উদ্যোক্তা ইত্যাদি) পরস্পরের সাথে এমন ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া ঘটায় যাতে তাদের মধ্যে একটি সুষ্ঠু পারস্পরিক বোঝাপড়া ও সমন্বয়সাধন হয়, তখন তাকে বলা যায় **অর্থব্যবস্থা**। কোনো দেশে বিভিন্ন ধরনের অর্থনৈতিক ক্রিয়াকলাপ যে রীতিনীতি এবং সামাজিক ও রাজনৈতিক ধারা অনুসরণ করে, তাকেই বলা যায় সেই দেশের অর্থব্যবস্থা।

এখানে উল্লেখ্য যে মানুষ তার অভাব পরিপূরণের জন্য যে সকল কর্মকাণ্ডে যুক্ত থাকে, সেগুলিকেই **অর্থনৈতিক ক্রিয়াকলাপ** বলা হয়। এই ক্রিয়াকলাপ মূলত **চার** প্রকার ঃ (ক) অভাব পরিপূরণের জন্য প্রয়োজনীয় দ্রব্য ও সেবাকর্ম উৎপাদন, (খ) দ্রব্য ও সেবাসমূহের ক্রয় ও বিক্রয়, (গ) উৎপাদনের উপাদানগুলির মধ্যে আয়ের বণ্টন, এবং (ঘ) অভাব পরিপূরণের জন্য বিভিন্ন দ্রব্য ও সেবাসমূহের ভোগ।

● **মানুষের অভাব অসীম ঃ** মানবসভ্যতার ক্রমোন্নতির সাথে সাথে মানুষের অভাবের পরিধিও বিস্তৃত হয়েছে। অন্ন-বস্ত্র-বাসস্থান ইত্যাদি প্রাথমিক অভাবগুলি ছাড়াও জীবনধারণের মান উন্নয়নের জন্য মানুষের আরও নানা উপকরণের প্রয়োজন হয়। একটির অভাব পূরণ হলেই আর একটি এসে উপস্থিত হয়। আবার, বিভিন্ন দ্রব্য ও সেবার অভাব চক্রাকারে আবর্তিত হয়। স্বল্প পরিমাণ দ্রব্য ও সেবা উপভোগের তুলনায় মানুষ সর্বদাই অধিক পরিমাণ দ্রব্য ও সেবা উপভোগ পছন্দ করে। কাজেই, মানুষের অভাবের কোনো সীমা নেই। অভাব অনন্ত।

● **ভোগ ঃ** মানুষ জীবনধারণের জন্য এবং অভাব পরিপূরণের জন্য নানা ধরনের দ্রব্য এবং সেবা প্রতিনিয়ত ব্যবহার করে। যেমন — পোশাক-পরিচ্ছদ, বই, খাতা, কলম, চেয়ার, টেবিল, খাট, বিছানা ইত্যাদি বিভিন্ন বস্তুগত দ্রব্য ব্যবহারের মাধ্যমে মানুষের বিভিন্ন অভাব তৃপ্ত হয়। অর্থাৎ, এই সকল দ্রব্য ব্যবহার করে আমরা যে উপযোগ পাই তার মাধ্যমেই আমাদের অভাব তৃপ্ত হয়। প্রতিনিয়ত ব্যবহারের মাধ্যমে একসময় ওই দ্রব্যের উপযোগ সৃষ্টির ক্ষমতা নিঃশেষ হয়। যেমন — একটি খাতা ব্যবহার করার পর যখন সেখানে লেখার মতো পৃষ্ঠা থাকে না, তখন তার কোনো উপযোগ আমাদের কাছে থাকে না। নানা সেবাদ্রব্যও মানুষের অভাব পূরণ করে। যেমন — শিক্ষা, চিকিৎসা, ভ্রমণ ইত্যাদি পরিষেবাও মানুষকে তৃপ্ত করে। এই সকল দ্রব্য বা সেবা যখন সরাসরি মানুষের অভাব পূরণ করে এবং এগুলি ব্যবহারের মাধ্যমে যখন দ্রব্য বা সেবার উপযোগ ক্রমশ নিঃশেষ হতে থাকে, তখন তাকেই বলা হয় **ভোগ**। কাজেই, বিভিন্ন দ্রব্য ও সেবার ব্যবহারের মাধ্যমে সেগুলির উপযোগ নিঃশেষ করার প্রক্রিয়াটিকেই বলা যায় ভোগ। সুতরাং ভোগ হল একটি প্রক্রিয়া (Process)।

● **উৎপাদন ঃ** ভোগের জন্য প্রয়োজনীয় দ্রব্য ও সেবাকর্মের উৎপাদনও প্রয়োজন। উৎপাদনের জন্য প্রয়োজনীয় উপকরণগুলিকে উৎপাদনের উপাদান বলা হয়। উৎপাদনের মূল উপাদানগুলি হল জমি, শ্রম, মূলধন এবং উদ্যোগ। এই উপাদানগুলিকে ব্যবহার করেই উৎপাদন প্রক্রিয়া চলতে থাকে।

● **উৎপাদিত দ্রব্য ও সেবাকর্মের বিনিময় ঃ** কোনো উদ্যোক্তা বা ব্যক্তির পক্ষেই এককভাবে বিভিন্ন দ্রব্য ও সেবাকর্ম উৎপাদন করা সম্ভব নয়। যে-কোনো অর্থনীতিতে ভিন্ন ভিন্ন উদ্যোক্তা ভিন্ন ভিন্ন দ্রব্য ও সেবাকর্ম উৎপাদনে বিশেষভাবে পারদর্শী হয়ে উঠে। এর পর উৎপাদিত দ্রব্য ও সেবাকর্মসমূহের বিনিময়ের মাধ্যমে যেকোনো ব্যক্তির পক্ষে একই সাথে বিভিন্ন দ্রব্য ও সেবা ভোগ করা সম্ভব হয়। আধুনিক অর্থব্যবস্থায় অর্থের মাধ্যমেই এই বিনিময়ের কাজ সম্পাদিত হয়।

● **উৎপাদনের উপাদানসমূহের মধ্যে আয়ের বণ্টন ঃ** দ্রব্য ও সেবাসমূহের বিক্রয়ের মাধ্যমে উপার্জিত আয়, মূলত উৎপাদনের উপাদানসমূহের মধ্যেই বণ্টিত হয়। অর্থাৎ জমির মালিক 'খাজনা' (rent), শ্রমের মালিক 'মজুরি' (wages), মূলধনের মালিক 'সুদ' (interest) এবং উদ্যোগ গ্রহণের পুরস্কার হিসাবে উদ্যোক্তা 'মুনাফা' (profit) উপার্জন করে।

একটি অর্থব্যবস্থাকে তখনই যথার্থ বলা যায় যখন নানা অর্থনৈতিক বিশৃঙ্খলা ও সমস্যার পরিপ্রেক্ষিতে সেই ব্যবস্থার মধ্যে উপযুক্ত প্রতিষেধকের ব্যবস্থা থাকে। যেমন — এই সমস্যার মোকাবিলা যদি একমাত্র সরকারি নির্দেশ ও নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে হয় এবং যদি দেশের সমস্ত সম্পত্তির মালিকানা রাষ্ট্রের হাতে কেন্দ্রীভূত থাকে, তবে তাকে **সমাজতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থা** (Socialistic system of economy) বলা হয়। অন্যদিকে, যদি বাজার ব্যবস্থা বা দাম-ব্যবস্থার মাধ্যমে এই সমস্যার সমাধান হয় এবং অর্থনৈতিক কার্যকলাপে তেমন সরকারি হস্তক্ষেপ না থাকে, তখন তাকে **ধনতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থা** (Capitalistic system of economy) বলা হয়। এছাড়া, যেখানে ধনতান্ত্রিক এবং সমাজতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থার বৈশিষ্ট্যগুলির মিশ্রণ দেখা যায়, অর্থাৎ সরকারি এবং বেসরকারি ক্ষেত্রের সহাবস্থান লক্ষ্য করা যায়, তাকে বলা হয় **মিশ্র অর্থব্যবস্থা** (Mixed economic system)। ভারতীয় অর্থব্যবস্থা এই ধরনের মিশ্র অর্থব্যবস্থার প্রকৃষ্ট উদাহরণ।

২.২.১. অর্থব্যবস্থার বুনিয়াদি এককসমূহ (Basic economic agents of any economic system)

যেকোনো অর্থব্যবস্থায় অর্থনৈতিক কাজকর্মকে প্রধানত দুটি ভাগে ভাগ করা যায় ঃ (১) বিভিন্ন দ্রব্য ভোগ এবং (২) প্রয়োজনীয় দ্রব্যের উৎপাদন। কোনো অর্থব্যবস্থায় একেবারে প্রাথমিক পর্যায়ে যে ব্যক্তি বা সংস্থা এই সকল অর্থনৈতিক ক্রিয়াকলাপে যুক্ত থাকে তাদেরকে অর্থব্যবস্থার বুনিয়াদি একক বলা হয়। সুতরাং, এই অর্থনৈতিক কাজকর্মের উপর ভিত্তি করে বলা যায় যে, অর্থব্যবস্থার প্রধান দুটি বুনিয়াদি একক হল ঃ **ভোক্তা** (Consumer) এবং **উৎপাদক** (Producer) বা **উদ্যোক্তা**। তবে যে-কোনো দেশে প্রতিরক্ষা, প্রশাসন, জনকল্যাণমূলক কাজকর্ম ইত্যাদির ক্ষেত্রে **সরকারের** ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কাজেই, সরকারকেও অর্থব্যবস্থার একটি গুরুত্বপূর্ণ একক বলা হয়। এছাড়াও দেশে ব্যাংকিং সংস্থা, শ্রমিক সংগঠন ইত্যাদিকেও অর্থব্যবস্থার একক হিসাবে গণ্য করা যায়।

আমরা ইতিমধ্যে যে আলোচনা করেছি তাতে বোঝা যায় যে কোনো অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় মূল দুটি অর্থনৈতিক কাজ হল 'ভোগ' এবং 'উৎপাদন'। অর্থনীতিতে যে সকল ব্যক্তি ও সংস্থার মাধ্যমে এই 'ভোগ প্রক্রিয়া' সম্পন্ন হয়, তাদেরকেই 'ভোক্তা' আখ্যা দেওয়া হয়। কোনো ভোক্তাকে অর্থনৈতিক ক্রিয়াকলাপের সঙ্গে যুক্ত ক্ষুদ্রতম 'একক' বা 'প্রতিনিধি'(Agent) হিসাবে গণ্য করা হয়। অবশ্য এই ভোক্তার অবস্থান একটি পরিবারের মধ্যে। পরিবার (Family) হল কোনো সমাজব্যবস্থায় ক্ষুদ্রতম সামাজিক একক।

● **অর্থনৈতিক ক্রিয়াকলাপে পরিবারের দ্বৈতভূমিকা ঃ** কোনো অর্থব্যবস্থায় অর্থনৈতিক ক্রিয়াকলাপে কোনো পরিবার যে দ্বৈতভূমিকা পালন করে তা হল —

(ক) **বিভিন্ন ভোগ্যদ্রব্যের ক্রেতা বা ভোক্তা ঃ** একটি পরিবারের অন্তর্ভুক্ত সদস্যগণ পারিবারিক ভোগের জন্য বিভিন্ন দ্রব্য ও সেবা ক্রয় করে। যেমন, পরিবারের অন্তর্ভুক্ত সদস্যগণ খাদ্যদ্রব্য, পোশাক-পরিচ্ছদ, বিলাসবহুল সামগ্রী, পরিবহন পরিষেবা, ব্যাংকিং ও বিমা পরিষেবা, চিকিৎসা পরিষেবা ইত্যাদি দ্রব্য ও সেবাকর্ম ভোগের জন্যই ক্রয় করে (বা অর্থব্যয় করে)।

কাজেই যেকোনো অর্থব্যবস্থায় প্রতিনিয়ত অসংখ্য 'ভোক্তা' বিভিন্ন দ্রব্য ও সেবা ভোগ করে চলেছে। এই ভোক্তাদের উপস্থিতি না থাকলে বিভিন্ন ভোগ্যদ্রব্যের উৎপাদন গুরুত্বহীন হয়ে পড়ত সন্দেহ নেই।

(খ) **বিভিন্ন উপাদানের যোগানদাতা ঃ** প্রতিটি পরিবার যেমন বিভিন্ন দ্রব্যের ভোগকারী, তেমনভাবে তারা বিভিন্ন উপাদানের মালিকও বটে। যেমন, কোনো পরিবার 'জমির' মালিকানা ভোগ করে, কোনো পরিবার 'পুঁজি'র মালিকানা ভোগ করে, এবং কোনো পরিবার 'শ্রমশক্তি'র মালিক। কাজেই উৎপাদন প্রক্রিয়ায় এই পরিবারগুলি জমি, পুঁজি ও শ্রম সরবরাহ করে। এই সকল উপাদান সরবরাহ করে পরিবারগুলি আয় উপার্জন করে।

কোনো অর্থব্যবস্থায় অপর বুনিয়াদি এককটি হল উৎপাদক বা উৎপাদক সংস্থা। এই উৎপাদক সংস্থা বা কারবারি সংস্থা (Business firm) বিভিন্ন উপাদান নিয়োগের মাধ্যমে নানা দ্রব্য ও সেবা উৎপন্ন করে। এই উৎপাদনের কাজ যেমন কোনো ব্যক্তির দ্বারা সম্পন্ন হতে পারে (যেমন, কৃষক, তাঁতি, কামার, কুমোর ইত্যাদি) তেমনভাবে কোনো একমালিকী কারবার, অংশীদারি কারবার, যৌথ মূলধনি কারবার, সমবায় সমিতি এবং রাষ্ট্রীয় উদ্যোগে সম্পন্ন হতে পারে।

● **অর্থনৈতিক ক্রিয়াকলাপে কোনো উৎপাদক সংস্থার দ্বৈতভূমিকা ঃ** অর্থনৈতিক ক্রিয়াকলাপে কোনো পরিবার যেমন দ্বৈতভূমিকা পালন করে, তেমনভাবে কোনো উৎপাদক সংস্থাও দ্বৈতভূমিকা পালন করে।

(ক) **বিভিন্ন দ্রব্য ও সেবাকর্মের উৎপাদক ও বিক্রেতা ঃ** প্রতিটি উৎপাদক সংস্থা কোনো না কোনো দ্রব্য বা সেবাকর্ম উৎপাদন করে এবং বিভিন্ন বাজারে সেগুলি বিক্রয় করে। এই সকল দ্রব্য ও সেবা ক্রয় করে বিভিন্ন পরিবার। কাজেই পরিবারগুলির ভোগ ব্যয় কারবারি সংস্থাসমূহের আয় হিসাবে গণ্য হয়।

(খ) **বিভিন্ন উপাদানের ক্রেতা ঃ** উৎপাদনের কাজ অব্যাহত রাখার জন্য উৎপাদক সংস্থাগুলি উৎপাদনের বিভিন্ন উপাদান (যেমন, শ্রম, মূলধন, জমি ইত্যাদি) ক্রয় করে। অথবা বলা যায়, এই সকল উপাদানের পরিষেবা তারা ক্রয় করে। যে পরিবারগুলি এই সকল উপাদানের মালিকানা ভোগ করে, তাদের কাছ থেকেই উৎপাদক সংস্থাগুলি এই উপাদানসমূহ ক্রয় করে। এই উপাদানগুলি ক্রয়ের জন্য উৎপাদক সংস্থা যে মূল্য প্রদান করে (যেমন, মজুরি, সুদ, এবং খাজনা) তা বিভিন্ন পরিবারের আয় হিসাবে সৃষ্ট হয়।

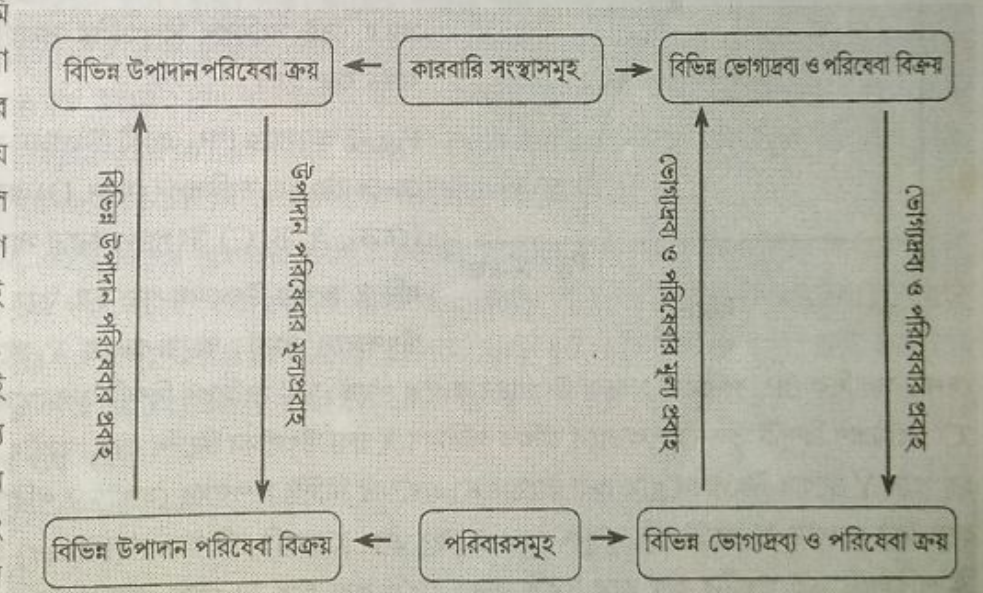

Fig.-1

কোনো অর্থব্যবস্থায় বুনিয়াদি একক হিসাবে যখন অসংখ্য ভোগকারী একক বা পরিবার এবং অসংখ্য উৎপাদনকারী একক বা কারবারি সংস্থা অর্থনৈতিক কার্যকলাপে লিপ্ত হয়, তখন উৎপাদন, ভোগ, বিনিময় ও আয়ের যে প্রবাহ (flow) সৃষ্টি হয় তা একটি রেখাচিত্রের (Fig.-1) মাধ্যমে দেখানো যায়।

২.২.২. অর্থনীতির মূল সমস্যাসমূহ (Basic problems of an economy)

মানুষের অভাব অসীম। কিন্তু এই অসীম অভাবের পরিপ্রেক্ষিতে অভাবপূরণের উপকরণের যোগান সীমিত। কাজেই, প্রতিটি অর্থব্যবস্থার প্রধান কাজই হল এই সীমিত উপকরণগুলির উপযুক্ত ও দক্ষ ব্যবহারের মাধ্যমে মানুষের ভোগ্যসামগ্রীর যোগান দেওয়া।

এই সীমিত উপকরণের পরিপ্রেক্ষিতে প্রতিটি অর্থব্যবস্থাই যে মূল সমস্যার সম্মুখীন হয়, তা হল ঃ

(১) কি দ্রব্য উৎপাদিত হবে এবং কি পরিমাণে?

(২) দ্রব্যটি কিভাবে উৎপাদন করা হবে?

(৩) কাদের জন্য দ্রব্যটি উৎপাদন করা হবে?

22

এই সমস্যাগুলির সাথে সম্পর্কযুক্ত আরেকটি অর্থনৈতিক সমস্যা হল ঃ অর্থনীতিতে সম্পদসমূহের দক্ষ ব্যবহার হচ্ছে কি? এই সমস্যাগুলির সমাধান করাই হল যেকোনো অর্থব্যবস্থার মূল কাজ।

প্রথমত, যেহেতু যেকোনো অর্থনীতিতে উপাদানের যোগান সীমিত কাজেই, এই সীমিত উপকরণের সাহায্যে কোন্ দ্রব্য কি পরিমাণে উৎপাদন করা হবে, সেই বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ অত্যন্ত জরুরি। ধরা যাক, জমির যোগান সীমিত। এই জমিতে কেবল ধান এবং রবারচাষ হয়। অর্থাৎ, ধানচাষ বাড়াতে হলে রবারচাষ কমাতে হবে। অর্থাৎ, একটির উৎপাদন বাড়াতে হলে অপরটির উৎপাদন কমাতে হবে। সুতরাং, খাদ্যশস্য, না অর্থকরী শস্য — কোন্‌টি তুলনামূলকভাবে অধিক উৎপাদন করা দরকার, সে বিষয়ে সিদ্ধান্ত নিতে হবে।

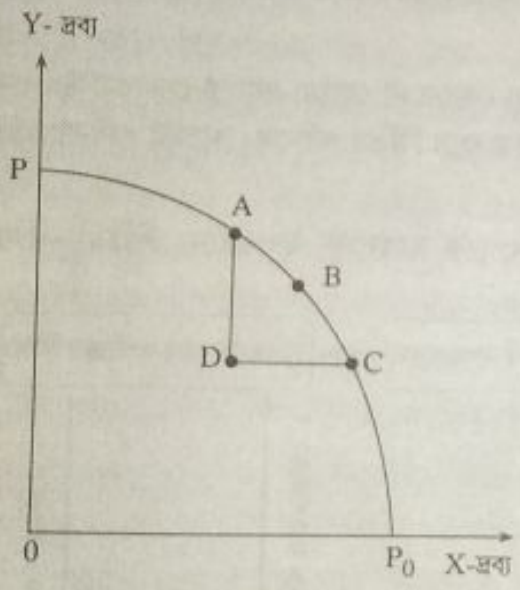

Fig.-2

একটি উৎপাদন সম্ভাবনা রেখার সাহায্যে (Production possibility curve) বিষয়টি ব্যাখ্যা করা যেতে পারে। কোনো দেশে নির্দিষ্ট পরিমাণ সম্পদ এবং প্রকৌশলের পরিপ্রেক্ষিতে দুটি দ্রব্যের যে বিভিন্ন সংমিশ্রণ উৎপাদন সম্ভব সেই সংমিশ্রণ বিন্দুগুলির সমাহারে একটি উৎপাদন সম্ভাবনা রেখা অঙ্কন করা হয়।

Fig.-2 অনুসারে PP_0 একটি উৎপাদন সম্ভাবনা রেখা। এই রেখার অভ্যন্তরে যে-কোনো দ্রব্য সংমিশ্রণ (যেমন, D) এবং এই রেখাবরাবর দ্রব্য সংমিশ্রণসমূহ (যেমন, A, B, C) উৎপাদন করার সামর্থ্য দেশটির আছে।

যদি X দ্রব্যের উৎপাদন শূন্য হয়, তবে দেশটি সর্বাধিক 0P পরিমাণ Y দ্রব্য উৎপাদনে সমর্থ। অনুরূপভাবে Y দ্রব্যের উৎপাদন যদি শূন্য হয়, তবে দেশটি সর্বাধিক $0P_0$ পরিমাণ X দ্রব্য উৎপাদন করতে পারে। 'A' সংমিশ্রণ বিন্দুটি তুলনামূলকভাবে অধিক পরিমাণ Y দ্রব্য এবং 'C' সংমিশ্রণ বিন্দুটি তুলনামূলকভাবে অধিক পরিমাণ X দ্রব্য উৎপাদন নির্দেশ করে। অর্থাৎ, X দ্রব্যের উৎপাদন যদি বৃদ্ধি করতে হয় তবে Y দ্রব্যের উৎপাদন হ্রাস করা প্রয়োজন। এখানেই নির্দিষ্ট সম্পদের যোগানের পরিপ্রেক্ষিতে উৎপাদন সিদ্ধান্তটি প্রাসঙ্গিক হয়ে উঠে। যেমন, Y দ্রব্যটি যদি 'বন্দুক' (guns) হয় এবং X দ্রব্যটি যদি 'মাখন' (butter) হয় তবে 'কি উৎপাদন করা হবে এবং কি পরিমাণে' এই প্রশ্নটির অর্থ হবে 'বেশি বন্দুক তৈরি করা হবে, না বেশি পরিমাণে মাখন'। অর্থাৎ, উৎপাদন সম্ভাবনা রেখার উপর উৎপাদন সংমিশ্রণ বিন্দুগুলির মধ্যে কোন্‌টি নির্বাচন করা হবে — সেই বিষয়টি গুরুত্বপূর্ণ। যদি কোনো দেশ 'D' সংমিশ্রণ বিন্দুটি উৎপাদন করে তবে তার অর্থ হল দেশের সম্পদের পূর্ণ ব্যবহার হয়নি। অর্থাৎ উপাদানের দক্ষ ব্যবহার সম্ভব হয় নি। এক্ষেত্রে একটি দ্রব্যের উৎপাদন অপরিবর্তিত রেখেও অপর দ্রব্যের উৎপাদন বৃদ্ধি সম্ভব। যেমন — D সংমিশ্রণ বিন্দু থেকে A বিন্দুতে গমনের অর্থ হল X দ্রব্যের উৎপাদন স্থির রেখে Y দ্রব্যের উৎপাদন বৃদ্ধি। অনুরূপভাবে, D বিন্দু থেকে C বিন্দুতে গমনের অর্থ হল Y দ্রব্যের উৎপাদন স্থির রেখে, X দ্রব্যের উৎপাদন বৃদ্ধি। তবে উৎপাদন সম্ভাবনা রেখার সীমার বাইরে কোনো সংমিশ্রণ বিন্দু নির্বাচন করা সম্ভব নয়, কারণ সেটি দেশের নির্দিষ্ট সম্পদ ও কলাকৌশলের আয়ত্তের বাইরে।

দ্বিতীয়ত, কোনো দ্রব্য শ্রম-নিবিড় প্রকৌশল অথবা মূলধন-নিবিড় প্রকৌশলের সাহায্যে উৎপাদন করা সম্ভব। উপাদানের যোগান সীমিত হওয়ায় বিভিন্ন দ্রব্য উৎপাদনের কাজে উপাদানগুলিকে এমনভাবে ব্যবহার করা দরকার যাতে সবচেয়ে কম খরচে

সর্বাধিক উৎপাদন সম্ভব হয়। যে উৎপাদন কৌশলে মূলধনের তুলনায় শ্রমের নিয়োগ বেশি হয়, তাকেই **শ্রম-নিবিড় প্রকৌশল** (Labour-intensive technology) বলা হয়। অন্যদিকে যে উৎপাদন কৌশলে শ্রমের তুলনায় মূলধনের নিয়োগ বেশি হয়, তাকে **মূলধন-নিবিড় প্রকৌশল** (Capital-intensive technology) বলা হয়।

23

তৃতীয়ত, যে দ্রব্যগুলি উৎপাদন করা হবে সেগুলি বেশির ভাগ মানুষের প্রয়োজনে লাগতে পারে, অথবা মুষ্টিমেয় কিছু মানুষের অভাবপূরণ করতে পারে। যে দ্রব্যগুলি বেশির ভাগ মানুষের ভোগের প্রয়োজনে ব্যবহৃত হয়, সেগুলিকে **গণভোগ্য দ্রব্য** (consumption goods) বলে। কাজেই, অধিক মানুষের কল্যাণসাধন, না মুষ্টিমেয় মানুষের অভাবপূরণ — কোনটি কাম্য, সে বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ জরুরি।

ধনতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থায় দামব্যবস্থার (Price system) মাধ্যমে উপরিউক্ত সমস্যাগুলির সমাধান হয়। অন্যদিকে, সমাজতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থায় রাষ্ট্রই সমস্ত উপাদানের মালিক এবং রাষ্ট্রীয় সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ঐ সমস্যাগুলির সমাধান করা হয়।

২.২.৩. দাম ব্যবস্থার মাধ্যমে বণ্টনের সমস্যার সমাধান (Solution to the problems of distribution through price system)

বাজার অর্থনীতিতে দাম ব্যবস্থায় প্রাধান্য থাকে। মূলত যে অর্থনীতিতে বা অর্থব্যবস্থায় বাজারে চাহিদা ও যোগানের শক্তির উপর সরকারের বিশেষ কোনো নিয়ন্ত্রণ রাখা হয় না, তাকেই **বাজার অর্থনীতি** বলা হয়। অর্থনীতিতে বিভিন্ন দ্রব্য ও সেবাকর্মের বাজার দাম এই চাহিদা ও যোগানের শক্তির মাধ্যমেই নির্ধারিত হয়। সাধারণত কোনো দ্রব্যের চাহিদা সেই দ্রব্যটির দামের উপর নির্ভর করে। লক্ষ্য করা যায়, অন্যান্য অবস্থা (যেমন, ক্রেতাদের আয়, রুচি ও পছন্দ ইত্যাদি) স্থির থাকলে যদি দ্রব্যটির দাম বৃদ্ধি (হ্রাস) পায়, তবে বাজারে দ্রব্যটির চাহিদার পরিমাণ হ্রাস (বৃদ্ধি) পায়। **কাজেই বাজার দাম এবং কোনো দ্রব্যের চাহিদার পরিমাণে পরিবর্তনের সম্পর্ক পরস্পর বিপরীতমুখী।** অন্যদিকে দ্রব্যটির যোগানদাতাদের দৃষ্টিকোণ থেকে অন্যান্য অবস্থা (যেমন, উৎপাদন প্রকৌশল, উৎপাদনের উপকরণসমূহের দাম ইত্যাদি) স্থির থাকাকালীন যদি কোনো দ্রব্যের বাজার দাম বৃদ্ধি পায়, তবে তারা সেই দ্রব্যটির যোগান বৃদ্ধিতে আগ্রহী হয়। অনুরূপভাবে দ্রব্যটির বাজার দাম হ্রাস পেলে বাজারে দ্রব্যটির যোগানের পরিমাণও হ্রাস পায়। কাজেই কোনো দ্রব্যের বাজার দামের সাথে দ্রব্যটির যোগানের সম্পর্ক পরস্পর সমমুখী।

সুতরাং বোঝা যাচ্ছে, কোনো দ্রব্যের একটি বিশেষ দামস্তরে বাজারে দ্রব্যটির সামগ্রিক চাহিদা, দ্রব্যটির সামগ্রিক যোগানের পরিমাণের তুলনায় বেশি, কম বা সমান হতে পারে। যদি দ্রব্যটির সামগ্রিক চাহিদার পরিমাণ সামগ্রিক যোগানের পরিমাণের তুলনায় বেশি হয়, তবে **উদ্বৃত্ত চাহিদার অবস্থা** (Excess demand condition) সৃষ্টি হয়। এই অবস্থায় ক্রেতাদের মধ্যে দ্রব্যটি ক্রয়ের জন্য একটি প্রতিযোগিতা শুরু হয় এবং তাদের মধ্যে অনেকে দ্রব্যটি ক্রয়ের জন্য বেশি দাম দিতেও রাজি থাকে। ফলে দ্রব্যটির **বাজার দাম বৃদ্ধি পেতে শুরু করে।**

আবার দ্রব্যটির সামগ্রিক যোগানের পরিমাণ যখন সামগ্রিক চাহিদার তুলনায় বেশি হয়, তখন বাজারে দ্রব্যটির **উদ্বৃত্ত যোগানের অবস্থা** (Excess supply condition) সৃষ্টি হয়। তখন কিছু কিছু যোগানদাতা তাদের দ্রব্যভান্ডার বাজারজাত করার জন্য কম দামেও বিক্রয় করতে রাজি হয়। ফলে **বাজার দাম হ্রাস পেতে শুরু করে।** তবে যখন কোনো দামের স্তরে বাজারে কোনো দ্রব্যের সামগ্রিক চাহিদা ও যোগানের পরিমাণ পরস্পর সমান হয়ে পড়ে, তখন বাজার দামে স্থিতাবস্থা বজায় থাকে। এই অবস্থাকে **বাজার দামের ভারসাম্য অবস্থা** (Equilibrium condition) বলা হয়। কাজেই বাজারে বিভিন্ন দ্রব্য ও সেবাকর্মের চাহিদা ও যোগানের ঘাত-প্রতিঘাতে প্রতিনিয়ত বাজার দামের যে ওঠানামা লক্ষ্য করা যায়, তাকেই **দাম ব্যবস্থা** (Price System) বলা যায়। পরবর্তী অধ্যায়ে আমরা এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করব।

২.২.৪. দাম ব্যবস্থা ও ভোগ্যদ্রব্যের বণ্টন (Price system and allocation of consumption goods)

কোনো অর্থনীতিতে নির্দিষ্ট সময়ে যে পরিমাণ দ্রব্য ও সেবাকর্মের উৎপাদন হয়, বিভিন্ন শ্রেণির ভোক্তাদের মধ্যে সেগুলির উপযুক্ত বণ্টন একটি অন্যতম সমস্যা। বাজার অর্থনীতিতে দাম ব্যবস্থার মাধ্যমে আপনা-আপনি ভোগ্যদ্রব্যের এই বণ্টনের সমস্যার সমাধান হয়। যেমন, কোনো দ্রব্যের যদি উদ্বৃত্ত চাহিদার সৃষ্টি হয় তবে দ্রব্যটির বাজার দাম বৃদ্ধি পাবে। আবার বাজার দাম

বৃদ্ধি পেলে কিছু ক্রেতার ক্রয়ক্ষমতা হ্রাস পাবে (কারণ তাদের আয় স্থির)। ফলে তারা ওই দ্রব্যটি আগের চেয়ে স্বল্প পরিমাণে ক্রয় করবে। অন্যদিকে দাম বৃদ্ধি পেলে বাজারে দ্রব্যটির যোগানের পরিমাণ ধীরে ধীরে বৃদ্ধি পাবে। এইভাবে দাম ব্যবস্থার মাধ্যমে দ্রব্যটির কাম্য বণ্টনের কাজটি সমাধা হবে। এই অবস্থাটিকে উদ্বৃত্ত চাহিদার অবস্থায় ভোগ্যদ্রব্য বন্টনে **দাম-রেশনিং** (Price-rationing) ব্যবস্থা বলা হয়।

অন্যদিক থেকে বলা যায়, দাম ব্যবস্থায় যেমন — বিভিন্ন দ্রব্যের বাজার দাম নির্ধারিত হয় তেমনভাবে বিভিন্ন উপাদানের (যেমন, শ্রম, মূলধন ইত্যাদি) বাজার দামও নির্ধারিত হয়। যেমন, শ্রমের বাজারে শ্রমের চাহিদা ও যোগানের ঘাত-প্রতিঘাতে ভারসাম্য মজুরির হার নির্ধারিত হয় ; মূলধনের বাজারে মূলধনের চাহিদা ও যোগানের মাধ্যমে ভারসাম্য সুদের হার নির্ধারিত হয় ইত্যাদি। **কাজেই যে সকল ব্যক্তি বা পরিবার এই উপাদানসমূহ সরবরাহ করে তাদের আয়ও এই দাম ব্যবস্থার মাধ্যমেই নির্ধারিত হয়ে যায়।** সুতরাং বাজার অর্থনীতিতে দাম ব্যবস্থার মাধ্যমে একদিকে বিভিন্ন দ্রব্যসামগ্রীর দাম এবং অন্যদিকে বিভিন্ন উপাদান সরবরাহকারী পরিবারসমূহের আয় (বা উপাদানসমূহের দাম) স্থির হয়। ভোগকারী পরিবারসমূহ তখন তাদের নির্দিষ্ট আয় এবং দ্রব্যসামগ্রীর নির্দিষ্ট দামের সাপেক্ষে এমন পরিমাণ দ্রব্য ক্রয় করে যাতে তাদের ভোগসন্তুষ্টি (বা দ্রব্যসমূহের ভোগ থেকে প্রাপ্ত উপযোগ) একটি সর্বোচ্চ পর্যায়ে পৌঁছায়।

২.২.৫. দাম ব্যবস্থা এবং উপাদানের বণ্টন (Price system and allocation of factors of production)

বাজার অর্থনীতিতে দাম ব্যবস্থার মাধ্যমে বিভিন্ন দ্রব্যের উৎপাদনে উপাদানসমূহের কাম্য বণ্টনও সুনিশ্চিত হয়। এই অর্থব্যবস্থায় উৎপাদক ও বিক্রেতারা তাদের মুনাফা সর্বোচ্চকরণের লক্ষ্যেই উৎপাদন ও বিক্রয়ের কাজ পরিচালনা করে। কাজেই বাজারে চাহিদা ও যোগানের শক্তির বাধাহীন ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ায় যখন কোনো দ্রব্যের দাম বৃদ্ধি পায়, তখন উৎপাদক সংস্থাগুলি ঐ দ্রব্য উৎপাদন ও বিক্রয়ের মাধ্যমে তাদের মুনাফা বাড়িয়ে তুলতে সক্ষম হয়। ফলে উৎপাদনের উপকরণগুলি ঐ দ্রব্য উৎপাদনের কাজেই বেশি পরিমাণে নিযুক্ত হয়। যেহেতু ওই দ্রব্যের বর্ধিত যোগান বাজারে ঐ দ্রব্যের জন্য সৃষ্ট বর্ধিত চাহিদার পূরণে সক্ষম হয়, সেহেতু বলা যায় উৎপাদনের উপকরণসমূহের কাম্য বন্টন হয়েছে। বাজারে যদি কোনো দ্রব্যের উপযুক্ত চাহিদা না থাকে এবং তা সত্ত্বেও উৎপাদনের উপাদানগুলিকে (অর্থাৎ জমি, শ্রম, মূলধন ইত্যাদি) ওই দ্রব্যের উৎপাদনে অধিক পরিমাণে নিয়োগ করা হয়, তবে বিপুল পরিমাণ দ্রব্য অবিক্রীত অবস্থায় থেকে যাবে। ফলে সেক্ষেত্রে উপাদানগুলি সঠিক উৎপাদনের ক্ষেত্রে নিযুক্ত হয়েছে, সেকথা বলা যাবে না।

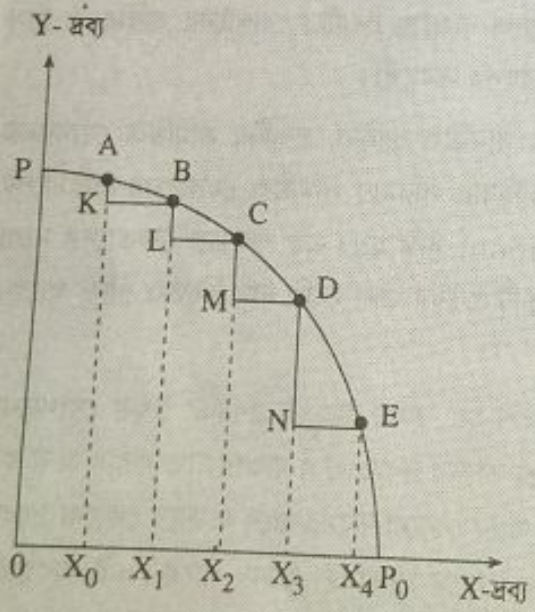

Fig.-3

দাম ব্যবস্থার মাধ্যমে কোনো অর্থনীতিতে বিভিন্ন দ্রব্যসামগ্রী উৎপাদনে নির্দিষ্ট পরিমাণ উপকরণসমূহের কাম্য বন্টন কিভাবে সম্ভব সেটি বিভিন্ন দ্রব্যের আপেক্ষিক দামের পরিবর্তন এবং তার ভিত্তিতে উৎপাদনের পরিমাণ নির্বাচনের ধারণার মাধ্যমে বোঝানো যেতে পারে।

● **উৎপাদন সম্ভাবনা রেখার সাহায্যে ব্যাখ্যা ঃ** ধরা যাক কোনো অর্থনীতিতে X এবং Y এই দুটি দ্রব্য উৎপাদিত হয় এবং এই দুটি দ্রব্যের বাজারদাম যথাক্রমে P_x এবং P_y । আমরা জানি কোনো অর্থনীতিতে নির্দিষ্ট পরিমাণ উপাদানের যোগান এবং নির্দিষ্ট উৎপাদন কৌশলের পরিপ্রেক্ষিতে X এবং Y-দ্রব্যের যেসকল সম্ভাব্য সংমিশ্রণ উৎপাদন সম্ভব সেই সংমিশ্রণ বিন্দুসমূহের সমাহার একটি **উৎপাদন সম্ভাবনা সীমান্ত** (Production Possibility Frontier) বা **উৎপাদন সম্ভাবনা রেখার** (Production Possibility Curve) মাধ্যমে নির্দেশ করা যায়।

এখন এই উৎপাদন সম্ভাবনা সীমান্ত এবং দ্রব্যের আপেক্ষিক দামের ধারণার সাহায্যে উপাদানের কাম্য বন্টনের বিষয়টি সহজে বোঝানো যেতে পারে। যদি $\frac{P_x}{P_y}$ বৃদ্ধি পায়, তবে তার অর্থ হল Y- দ্রব্যের সাপেক্ষে X-দ্রব্যের আপেক্ষিক দাম বৃদ্ধি পেয়েছে।

যেমন P_x যদি 80 টাকা থেকে বৃদ্ধি পেয়ে 150 টাকা হয় এবং P_y যদি 40 টাকা থেকে বৃদ্ধি পেয়ে 50 টাকা হয়, তবে $\frac{P_x}{P_y} = \frac{80}{40} = 2$ বা X-দ্রব্যের আপেক্ষিক দাম 2 একক Y থেকে বৃদ্ধি পেয়ে $\frac{P_x}{P_y} = \frac{150}{50} = 3$ একক Y হবে (অর্থাৎ 1X = 2Y থেকে 1X = 3Y হবে)। কাজেই এক একক X-দ্রব্য বিক্রয় করলে পূর্বের তুলনায় অধিক পরিমাণে Y-দ্রব্য পাওয়া যাবে।

Fig.-3 অনুসারে PP_0 একটি উৎপাদন সম্ভাবনা রেখা। লক্ষ্য করা যাচ্ছে X-দ্রব্যের উৎপাদন যখন প্রথমে X_0X_1 = KB পরিমাণ বৃদ্ধি পায়, তখন Y দ্রব্যের উৎপাদন AK পরিমাণ হ্রাস পায়। এই পরিমাণ Y দ্রব্যকে X-দ্রব্য উৎপাদনের **সুযোগ ব্যয়** (Opportunity cost) বলা যায়। X-দ্রব্যের উৎপাদন যখন ক্রমশ বৃদ্ধি পেয়েছে, তখন X দ্রব্যের সুযোগ ব্যয় (অর্থাৎ Y- দ্রব্য উৎপাদনে হ্রাসের পরিমাণ) ক্রমাগত বৃদ্ধি পেয়েছে। এর মূল কারণ হল নির্দিষ্ট পরিমাণ উপাদান (ধরা যাক, ভূমি বা জমি) X এবং Y-দ্রব্য উৎপাদনে সমান দক্ষ নয়। যেমন — X-দ্রব্য যদি ধান হয় এবং Y-দ্রব্য যদি রবার হয়, তবে পাহাড়ি অঞ্চলের জমিকে (যেখানে রবার চাষ ভালো হয়) রবার উৎপাদনের কাজ থেকে সরিয়ে এনে ধান উৎপাদনের কাজে নিয়োগ করা হলে ক্রমশ অধিক পরিমাণ রবার উৎপাদনের সুযোগ হারাতে হবে।

এখন ধরা যাক, উৎপাদন সম্ভাবনা রেখার উপর D বিন্দুতে উৎপাদন হচ্ছে এবং ধরা যাক, MD =1 একক X-দ্রব্য এবং CM = 2 একক Y-দ্রব্য। অর্থাৎ, এই উৎপাদন সংমিশ্রণে X দ্রব্যের সুযোগ ব্যয় 2 একক Y-দ্রব্য। কিন্তু বাজারে যদি X দ্রব্যের আপেক্ষিক দাম 2 একক Y-দ্রব্য থেকে বৃদ্ধি পেয়ে 3 একক Y-দ্রব্য হয়, তবে অবশ্যই উৎপাদকেরা আরো বেশি পরিমাণে X-দ্রব্য উৎপাদন করবে এবং উৎপাদনের উপকরণসমূহ স্বাভাবিকভাবেই Y-দ্রব্যের উৎপাদন থেকে সরে এসে X-দ্রব্যের উৎপাদনে নিযুক্ত হবে। এর কারণ হল উৎপাদকদের দৃষ্টিকোণ থেকে X-দ্রব্যের সুযোগ ব্যয়ের তুলনায় বাজারে তার বিনিময় মূল্য (Y দ্রব্যের পরিপ্রেক্ষিতে) বেশি। কাজেই উৎপাদন সম্ভাবনা রেখার ওপর উৎপাদন সংমিশ্রণ বিন্দুটি তখন D বিন্দু থেকে E বিন্দুতে স্থানান্তরিত হবে। কারণ NE = 1 একক X-দ্রব্য এবং DN = 3 একক Y- দ্রব্য হলে সেখানে X-দ্রব্যের সুযোগ ব্যয়ও 3 একক Y-দ্রব্যের সমান হবে। অনুরূপভাবে বাজারে যদি Y -দ্রব্যের আপেক্ষিক দাম বৃদ্ধি পায়, তখন উৎপাদকেরা উৎপাদনের উপাদানসমূহকে X-দ্রব্যের উৎপাদন থেকে সরিয়ে এনে Y-দ্রব্য উৎপাদনে বেশি পরিমাণে নিয়োগ করবে।

এইভাবেই বাজার অর্থনীতিতে দাম ব্যবস্থার মাধ্যমে উৎপাদনের উপকরণসমূহের কাম্য বণ্টন এবং দক্ষ ব্যবহার সম্ভব।

২.২.৬. দাম ব্যবস্থার মাধ্যমে অর্থনীতির মূল সমস্যাসমূহের সমাধান (Solution to the basic problems of an economy through the price system)

আমরা ইতিমধ্যে যে আলোচনা করেছি তাতে বোঝা যায় যে, দাম ব্যবস্থার মাধ্যমে অর্থনীতির মূল সমস্যাগুলির সমাধান সম্ভব।

● **কি উৎপাদন হবে এবং কি পরিমাণে?** স্বাভাবিকভাবেই বাজারে যেসব দ্রব্যের বিনিময়মূল্য বা দাম রয়েছে কেবল সেসব দ্রব্যই উৎপাদন করা হবে। ফলে ঐ সকল দ্রব্যের উৎপাদনেই উৎপাদনের উপকরণ বা অর্থনীতির সম্পদসমূহ ব্যবহৃত হবে। যেসব দ্রব্যের কোন দাম নেই, সেগুলি উৎপাদন করা হবে না। এমন পরিমাণ উৎপাদন করা হবে যাতে কোনো দ্রব্যের নির্দিষ্ট দামে বাজারে যোগান এবং চাহিদার পরিমাণ পরস্পর সমান হয়। যদি চাহিদার তুলনায় স্বল্প পরিমাণ দ্রব্য উৎপন্ন হয়, তবে উদ্বৃত্ত চাহিদার সৃষ্টি হবে এবং দ্রব্যটির বাজার দাম বৃদ্ধি পাবে। ফলে উৎপাদকেরা ঐ দ্রব্য অধিক পরিমাণে উৎপাদন ও বিক্রয়ে আগ্রহী হবে। অন্যদিকে বর্ধিত দামে কিছু কিছু ক্রেতা দ্রব্যটি পূর্বের তুলনায় স্বল্প পরিমাণ ক্রয় করবে। এই প্রক্রিয়ায় নতুন দামস্তরে চাহিদা ও যোগানের পরিমাণ আবার সমান হয়ে পড়বে।

একইভাবে বলা যায়, কোনো দ্রব্যের নির্দিষ্ট দামে উৎপাদকেরা যদি দ্রব্যটির সামগ্রিক চাহিদার তুলনায় অধিক পরিমাণ দ্রব্য উৎপন্ন করে, তবে দ্রব্যটির উদ্বৃত্ত যোগানের সৃষ্টি হবে। তখন দ্রব্যটির বাজার দাম ধীরে ধীরে হ্রাস পাবে কারণ কিছু কিছু বিক্রেতা স্বল্প দামে তাদের মজুত করা দ্রব্যসম্ভার বিক্রয় করতে চাইবে। অর্থাৎ বিক্রেতাদের মধ্যে একটি প্রতিযোগিতা শুরু হবে। আবার দ্রব্যটির বাজার দাম হ্রাস পেতে থাকলে উৎপাদকেরা ঐ দ্রব্যটি পূর্বের তুলনায় স্বল্প পরিমাণে উৎপাদন ও বিক্রয় করবে। অন্যদিকে দ্রব্যটির ক্রেতারা স্বল্পদামে পূর্বের তুলনায় অধিক পরিমাণে দ্রব্য ক্রয়ে আগ্রহী হবে। এই প্রক্রিয়ায় আবার একটি দামস্তরে দ্রব্যটির

সামগ্রিক চাহিদা ও যোগানের পরিমাণ পরস্পর সমান হয়ে পড়বে। এইভাবেই দাম ব্যবস্থার মাধ্যমে অর্থনীতির প্রথম সমস্যাটির সমাধান হয়।

● **কিভাবে উৎপাদন হবে?** অর্থনীতির দ্বিতীয় মূল সমস্যাটির সমাধানও দাম ব্যবস্থার মাধ্যমে সম্ভব হয়। উৎপাদন প্রক্রিয়ায় শ্রম ও মূলধনের অনুপাতটি উৎপাদন কৌশলকে নির্দেশ করে। যদি উপাদানের বাজারে শ্রমের দাম (বা মজুরি) অপেক্ষাকৃত স্বল্প হয়, তবে উৎপাদকেরা মূলধনের তুলনায় শ্রম অধিক পরিমাণে নিয়োগ করবে। অর্থাৎ তখন শ্রম-নিবিড় প্রকৌশল ব্যবহৃত হবে। অন্যদিকে উপাদনের বাজারে শ্রমের তুলনায় মূলধনের দাম (বা সুদের হার) অপেক্ষাকৃত কম হলে উৎপাদকেরা শ্রমের তুলনায় মূলধন অধিক পরিমাণে নিয়োগ করবে। অর্থাৎ তখন মূলধন-নিবিড় প্রকৌশল ব্যবহৃত হবে।

এইভাবেই দাম ব্যবস্থার মাধ্যমে অর্থনীতির দ্বিতীয় মূল সমস্যাটির সমাধান সম্ভব।

● **কাদের জন্য উৎপাদন করা হবে?** দাম ব্যবস্থার মাধ্যমে যখন বিভিন্ন উপাদানের মূল্য নির্ধারিত হয়, তখন সেইসাথে ঐ উপাদানসমূহ (যেমন, শ্রম, জমি, মূলধন ইত্যাদি) সরবরাহকারী পরিবারগুলির আয়ও নির্ধারিত হয়। এই আয় পরিবারগুলির ক্রয়ক্ষমতা নির্দেশ করে। কাজেই দ্রব্যগুলির নির্দিষ্ট দামের পরিপ্রেক্ষিতে যেসব পরিবার তাদের ক্রয়ক্ষমতা অনুযায়ী ঐ সকল ক্রয়ে সমর্থ, তারাই দ্রব্যগুলি ভোগ করবে (ভোগ্য দ্রব্যের এই বন্টনের বিষয়ে আমরা ইতিপূর্বেই আলোচনা করেছি)। এইভাবে দাম ব্যবস্থার মাধ্যমে অর্থনীতির তৃতীয় মূল সমস্যাটিরও সমাধান সম্ভব।

১নং সারণীর মাধ্যমে এই বিষয়টি নির্দেশ করা হল।

সারণী-১

দাম ব্যবস্থার মাধ্যমে অর্থনীতির মূল সমস্যাগুলির সমাধান

মূল সমস্যা	দাম ব্যবস্থার মাধ্যমে সমাধান
(ক) কি উৎপাদন হবে এবং কি পরিমাণে?	১। যে সকল দ্রব্যের বিনিময় মূল্য বা দাম রয়েছে কেবলমাত্র সেই সকল দ্রব্যই উৎপাদন করা হবে। ২। বাজারে যেসব দ্রব্যগুলির দাম অপেক্ষাকৃত বেশি, সেসব দ্রব্যই বেশি পরিমাণে উৎপাদন করা হবে।
(খ) কিভাবে উৎপাদন হবে?	১। উপাদানগুলির বাজার দামের উপর ভিত্তি করে উৎপাদন প্রকৌশল নির্বাচন করা হবে। ২। যেসব উপাদানের বাজার দর অপেক্ষাকৃত কম, উৎপাদন প্রক্রিয়ায় সেসব উপাদানই বেশি পরিমাণে ব্যবহৃত হবে (যেমন, শ্রমের দাম বা মজুরি অপেক্ষাকৃত কম হলে শ্রম-নিবিড় প্রযুক্তি ব্যবহৃত হবে)।
(গ) কাদের জন্য উৎপাদন হবে?	১। ভোক্তাদের ক্রয়ক্ষমতার উপর বিভিন্ন দ্রব্যের ভোগ নির্ভর করে। ২। বিভিন্ন উপাদানমূল্যই উপাদান-সরবরাহকারী তথা ভোগকারী পরিবারসমূহের আয় ও ক্রয়ক্ষমতা নির্ধারণ করে।

● **দাম ব্যবস্থা কার্যকরী হওয়ার প্রয়োজনীয় শর্তসমূহ ঃ** কোনো অর্থনীতিতে দাম ব্যবস্থা কার্যকরী হওয়ার জন্য নিম্নলিখিত শর্তগুলি প্রতিপালিত হওয়া আবশ্যক ঃ

(১) অর্থনীতিতে বিভিন্ন উৎপাদক তাদের নিজস্ব ভোগের প্রয়োজনের তুলনায় অতিরিক্ত উৎপাদন করবে। যদি তা না হয়, তবে বাজারে বিক্রয়যোগ্য দ্রব্যের উপস্থিতি থাকবে না।

(২) দামের পরিবর্তনের সাথে সাথে বিক্রেতা এবং ক্রেতারা তাদের বিক্রয় ও ক্রয় সিদ্ধান্তে পরিবর্তন ঘটাবে। যদি তা না হয়, তবে বাজার দামের পরিবর্তনের মাধ্যমে উদ্বৃত্ত চাহিদা বা উদ্বৃত্ত যোগানের অবস্থা দূর হবে না।

(৩) উৎপাদিত বিভিন্ন দ্রব্য ও সেবাকর্মের 'বাজার' (market) থাকবে। অর্থাৎ মূল্যের নিয়ম অনুসারে বিভিন্ন দ্রব্যের ক্রয়-বিক্রয় হবে।

(৪) আইন মাফিক বিভিন্ন সম্পত্তির বেসরকারি মালিকানা স্বীকৃত হতে হবে। অর্থাৎ উৎপাদিত দ্রব্যসমূহের উপর উৎপাদকের মালিকানা যদি স্বীকৃত না হয়, তবে সে উৎপাদনে আগ্রহী হবে না।

27

● **দাম ব্যবস্থার সুবিধাসমূহ ঃ** দাম ব্যবস্থার প্রধান সুবিধাগুলি হল ঃ

(ক) এই ব্যবস্থাটি একটি স্বয়ংক্রিয় পদ্ধতির মাধ্যমে চাহিদা ও যোগানের অসমতা আপনা-আপনি দূর করে। ফলে কোনো সরকারি হস্তক্ষেপের প্রয়োজন হয় না।

(খ) এই ব্যবস্থার মাধ্যমে একদিকে উপাদানসমূহের কাম্য বন্টন এবং অন্যদিকে ভোগ্যদ্রব্যের কাম্য বন্টন সম্ভব হয়। ফলে বিভিন্ন দ্রব্য উৎপাদনে উপাদানের বন্টন সংক্রান্ত সিদ্ধান্ত এবং ভোক্তাদের মধ্যে ভোগ্যদ্রব্যের বিলি বন্টন সংক্রান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণের খরচ (Costs of decision-making) হ্রাস পায়।

(গ) এই ব্যবস্থায় উৎপাদন ও ভোগ সংক্রান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে উৎপাদক ও ভোক্তাদের স্বাধীনতা বজায় রাখা যায়।

২.২.৭. বাজার অর্থনীতির বৈশিষ্ট্যসমূহ (Basic features of market economy)

যে অর্থব্যবস্থায় সম্পত্তির ব্যক্তিগত মালিকানা স্বীকৃত হয় এবং রাষ্ট্রের হস্তক্ষেপ ছাড়াই বাজার ব্যবস্থা বা দামব্যবস্থার উপর ভিত্তি করে যাবতীয় অর্থনৈতিক সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়, তাকেই **বাজার অর্থনীতি** (Market economy) বলা হয়। সাধারণত ধনতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থায় বাজার অর্থনীতির অস্তিত্ব থাকে।

বাজার অর্থনীতি বলতে এমন এক অর্থব্যবস্থাকে বোঝানো হয়, যেখানে —

(ক) দেশে অর্থনৈতিক ক্রিয়াকলাপের উপর সরকারি হস্তক্ষেপ অনুপস্থিত ;

(খ) দেশে ভোক্তা এবং উৎপাদকেরা ভোগ এবং উৎপাদন সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে অবাধ স্বাধীনতা ভোগ করে ;

(গ) উৎপাদনের বিভিন্ন উপাদানের মালিকানা বিভিন্ন ব্যক্তির হাতে কেন্দ্রীভূত থাকে (অর্থাৎ সম্পত্তির ব্যক্তিগত মালিকানা স্বীকৃত হয়) ;

(ঘ) উৎপাদন ও উপাদানের বাজারে পূর্ণ প্রতিযোগিতার অবস্থা বিরাজ করে ;

(ঙ) সর্বাধিক মুনাফা লাভের উদ্দেশ্যে বেসরকারি উৎপাদন প্রতিষ্ঠানগুলি উৎপাদন চালায় ; এবং

(চ) বাজার শক্তির মাধ্যমে বা চাহিদা ও যোগানের ঘাত-প্রতিঘাতে নির্ধারিত দামের ভিত্তিতে উপাদানের তথা আয়ের বন্টন হয়।

উপরিউক্ত বিষয়গুলিকেই **বাজার অর্থনীতির মূল বৈশিষ্ট্য** হিসাবে চিহ্নিত করা হয়।

এই অর্থব্যবস্থায় বিভিন্ন অর্থনৈতিক ক্রিয়াকলাপে সরকারি হস্তক্ষেপ, নিয়ন্ত্রণ বা বাধানিষেধ থাকে না। উৎপাদকেরা কি দ্রব্য উৎপাদন করবে বা ভোক্তারা কি পরিমাণ দ্রব্য ভোগ করবে, এই সকল বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে সরকার কোনোভাবে হস্তক্ষেপ করে না।

কাজেই, উৎপাদন ও ভোগ সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে যথাক্রমে উৎপাদক ও ভোক্তারা অবাধ স্বাধীনতা ভোগ করে। এর ফলে দেশে শ্রম ও মূলধনের গতিশীলতা (Mobility) থাকে অবাধ। কাজেই, দেশে বিভিন্ন উপাদানের দামের উপর ভিত্তি করে উৎপাদকেরা তাদের মুনাফা সর্বোচ্চ করে তোলার জন্যই উৎপাদন চালায়। অন্যদিকে, ভোক্তারাও তাদের আয় ও দ্রব্যমূল্যের উপর ভিত্তি করে এমন পরিমাণ দ্রব্য ভোগ করতে চায় যাতে তাদের উপযোগিতা সর্বোচ্চ হয়। যেহেতু তাদের এই কার্যকলাপের উপর সরকারের

কোনো নিয়ন্ত্রণ বা হস্তক্ষেপ থাকে না, তাই এই অর্থব্যবস্থাকে **অবাধ উদ্যোগের অর্থনীতি** (Free enterprise economy) বলে। ভোক্তা ও উদ্যোক্তাদের সার্বভৌমত্ব-সম্পর্কিত এই ব্যবস্থাকে **অবাধ স্বাধীনতার তত্ত্বও** (Theory of *leissez faire*) বলা হয়।

এছাড়া, এই অর্থব্যবস্থায় দেশের জমি, মূলধন, শ্রম প্রভৃতি উপাদানের মালিকানা বেসরকারি ক্ষেত্রে কেন্দ্রীভূত থাকে। অর্থাৎ, উপাদানের মালিকগণ এমন ক্ষেত্রেই তাদের উপাদান নিয়োগ করবে, যেখানে আয়লাভের সম্ভাবনা সর্বাধিক।

এই ধরনের অর্থব্যবস্থায় দ্রব্য ও উপাদানের বাজারে পূর্ণ প্রতিযোগিতার অবস্থা বিরাজ করে। অর্থাৎ, বাজারে চাহিদা ও যোগানের ঘাত-প্রতিঘাতেই ভারসাম্য দাম নির্ধারিত হয়। উদ্বৃত্ত চাহিদা বা যোগানের পরিপ্রেক্ষিতে এই দাম ওঠানামা করে। দামের এই উত্থানপতনের মধ্যে দিয়েই উদ্বৃত্ত চাহিদা বা যোগানের অবস্থা আপনা-আপনি দূর হয়ে যায়। এই ধরনের অর্থব্যবস্থাকে তাই **বাজারভিত্তিক অর্থব্যবস্থা** (Market-based economy) বলে।

বর্তমানে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা, অস্ট্রেলিয়া, ফ্রান্স প্রভৃতি দেশে এই বাজারভিত্তিক অর্থব্যবস্থাই প্রাধান্য পেয়েছে। তা ছাড়া, বর্তমানে অর্থনৈতিক উদারীকরণ ও বিশ্বায়নের যুগে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে এই বাজারভিত্তিক অর্থব্যবস্থা সম্প্রসারণের উপরেই জোর দেওয়া হচ্ছে।

● **ধনতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থায় মুনাফার ভূমিকা ঃ** এই অর্থব্যবস্থায় উৎপাদকেরা মুনাফা সর্বোচ্চ করার লক্ষ্য সামনে রেখে উৎপাদন কাজ চালায়। অর্থাৎ এখানে উৎপাদকেরা এমন পরিমাণ দ্রব্য উৎপাদন করতে চায় যাতে উৎপাদন ব্যয় সর্বনিম্ন এবং বিক্রয় মূল্য সর্বোচ্চ হয় ; অর্থাৎ দ্রব্য বিক্রয় থেকে প্রাপ্ত নিট আয় বা মুনাফা সর্বাধিক করে তোলাই তাদের মূল লক্ষ্য। এই অর্থব্যবস্থায় উৎপাদন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে উৎপাদকেরা। এখানে সরকারি হস্তক্ষেপের অনুপস্থিতিতে জাতীয় উৎপাদন বৃদ্ধি নির্ভর করে বেসরকারি ক্ষেত্রে বিভিন্ন উৎপাদকদের উৎপাদন সিদ্ধান্তের উপর। আবার যেহেতু মুনাফালাভের উদ্দেশ্যের উপর ভিত্তি করে এই উৎপাদন সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়, কাজেই এই অর্থব্যবস্থায় মুনাফার ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

২.২.৮. বাজার অর্থনীতির অসুবিধাসমূহ (Difficulties of market economy)

যদিও বাজার অর্থনীতিতে দাম ব্যবস্থার মাধ্যমে অর্থনীতির মূল সমস্যাসমূহের সমাধান সম্ভব, কিন্তু তা সত্ত্বেও এই নিয়ন্ত্রণবিহীন দাম ব্যবস্থার কিছু অসুবিধাও আছে। অর্থাৎ বাজার অর্থব্যবস্থার বিভিন্ন সুবিধা থাকা সত্ত্বেও এই ধরনের অর্থব্যবস্থার বেশ কিছু অসুবিধাও আছে। এই অর্থব্যবস্থার প্রধান অসুবিধাগুলি হল ঃ

(ক) **সামাজিক কল্যাণের বিষয়টি উপেক্ষিত হয় ঃ** এই ধরনের অর্থব্যবস্থায় মূলত ব্যক্তিগত মুনাফা সর্বোচ্চ করার উদ্দেশ্য নিয়েই উৎপাদন প্রক্রিয়া চলতে থাকে। কিন্তু কোনো বিশেষ উৎপাদন প্রক্রিয়ার ফলে পরিবেশ যথেষ্ট দূষিত হওয়ার সম্ভাবনা থাকে এবং প্রাকৃতিক ভারসাম্য বিনষ্ট হতে পারে। সেক্ষেত্রে সমাজের বহু মানুষ ক্ষতিগ্রস্ত হয়। ফলে সামাজিক কল্যাণ সর্বাধিক হতে পারে না।

(খ) **একচেটিয়া শক্তির উদ্ভব ঃ** যদিও ধরে নেওয়া হয় যে এই ধরনের অর্থব্যবস্থায় প্রতিযোগিতামূলক পরিমণ্ডল গড়ে ওঠার ফলে একচেটিয়া শক্তির বিকাশ ঘটে না, কিন্তু বাস্তবে তার বিপরীত চিত্রই লক্ষ্য করা যায়। এক্ষেত্রে দ্রব্য ও সেবার বাজারে বেশ কিছু বৃহৎ কারবারি সংস্থা বা বহুজাতিক কারবারি সংস্থা বাজারে মোট যোগানের সিংহভাগ দখল করে একচেটিয়া শক্তি বিস্তার করে।

(গ) **একচেটিয়া শোষণের উদ্ভব ঃ** স্বল্পসংখ্যক কারবারি সংস্থা বিভিন্ন বাজারে একচেটিয়া শক্তির অধিকারী হলে শ্রমিক শোষণের সম্ভাবনা বৃদ্ধি পায়। অর্থাৎ, শ্রমিকদেরকে তাদের উপযুক্ত প্রাপ্তি থেকে বঞ্চিত করেই পুঁজিপতিরা বিপুল পরিমাণ মুনাফা বা উদ্বৃত্ত উপার্জনে সক্ষম হয়।

(ঘ) **আয় এবং সম্পদ বণ্টনে বৈষম্য ঃ** এই অর্থব্যবস্থায় মুষ্টিমেয় পুঁজিপতি এবং ধনী কারবারিদের পক্ষেই অপেক্ষাকৃত অধিক পরিমাণ অর্থ উপার্জন সম্ভব হয়। এর ফলে সমাজে বিভিন্ন শ্রেণির মানুষের মধ্যে আয় এবং সম্পদ বণ্টনে বৈষম্য দেখা দেয়। অর্থাৎ সমাজে মোট সম্পদ এবং আয়ের বেশির ভাগই মুষ্টিমেয় পুঁজিপতিদের হাতে কেন্দ্রীভূত থাকে।

(ঙ) **শ্রেণিবৈষম্য ও সংঘাত ঃ** শ্রমিক শ্রেণি যখন তাদের শোষণ ও বঞ্চনা সম্পর্কে ওয়াকিবহাল হয়, তখন তারা শ্রমিক সংগঠনের মাধ্যমে এর প্রতিবাদ করে। ফলে পুঁজিপতি ও শ্রমিক শ্রেণির মধ্যে শ্রেণিবৈষম্য এবং শ্রেণিসংঘাত প্রকট হয়ে উঠে। এর ফলে উৎপাদন প্রক্রিয়া ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

(চ) **অর্থনীতিতে অধিক অনিশ্চয়তা ঃ** এই বাজারভিত্তিক অর্থব্যবস্থায় চাহিদা এবং যোগানের ঘাতপ্রতিঘাতে বিভিন্ন দ্রব্যের বাজারদামে প্রতিনিয়ত পরিবর্তন ঘটে। দামস্তরে এই অস্থিরতা অর্থনীতিতে **অনিশ্চয়তার মাত্রা** (degree of uncertainty) বৃদ্ধি করে। এই অনিশ্চয়তা উৎপাদনমুখী বিনিয়োগ সিদ্ধান্ত এবং ভোগ সিদ্ধান্তের উপর বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে।

(ছ) **কর্মহীনতা বৃদ্ধির সম্ভাবনা ঃ** যেহেতু উৎপাদকেরা তাদের মুনাফা বৃদ্ধির লক্ষ্যে উৎপাদন কাজ চালায়, সেহেতু উৎপাদন ব্যয় হ্রাস করার জন্য তারা অনেক ক্ষেত্রেই যন্ত্র-নিবিড় বা মূলধন-নিবিড় উৎপাদন প্রকৌশল প্রয়োগ করে। এর ফলে অর্থনীতিতে কর্মহীনতার প্রকোপ বৃদ্ধির প্রবণতা থাকে।

২.৩. মিশ্র অর্থব্যবস্থা (Mixed economic system)

বর্তমানে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে খাঁটি ধনতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থা বা খাঁটি সমাজতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থা দেখা যায় না। খাঁটি ধনতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থায় অর্থনৈতিক সিদ্ধান্ত গ্রহণে ভোক্তা এবং উদ্যোক্তাদের সম্পূর্ণ স্বাধীনতা থাকে এবং অর্থনৈতিক ক্রিয়াকলাপে রাষ্ট্রের বিশেষ কোনো ভূমিকা থাকে না। কিন্তু খাঁটি সমাজতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থায় রাষ্ট্রই সমস্ত সম্পত্তির মালিকানা ভোগ করে এবং যাবতীয় অর্থনৈতিক সিদ্ধান্ত রাষ্ট্রই গ্রহণ করে। সকল ধরনের অর্থনীতিতেই ধনতান্ত্রিক ও সমাজতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থার বৈশিষ্ট্যের মিশ্রণ দেখা যায়। এই ধরনের অর্থব্যবস্থাকে **মিশ্র অর্থব্যবস্থা** বলা হয় (Mixed economy)। কোনো কোনো ক্ষেত্রে এই মিশ্রণে ধনতান্ত্রিক বৈশিষ্ট্যের ভাগ তুলনামূলকভাবে অধিক এবং কোথাও সমাজতান্ত্রিক বৈশিষ্ট্যের ভাগ বেশি হয়।

ধ্রুপদি অর্থবিজ্ঞানীগণ (Classical economists) পুঁজিবাদী অর্থব্যবস্থায় বিশ্বাসী ছিলেন। তাঁরা মনে করতেন যে, দামব্যবস্থার মাধ্যমেই যাবতীয় অর্থনৈতিক বিশৃঙ্খলার সমাধান হয়। কিন্তু 1930-এর দশকে বিশ্বব্যাপী মন্দার সময়ে এই দামব্যবস্থা অর্থনৈতিক মন্দাবস্থা দূর করার ক্ষেত্রে ব্যর্থ হয়। তখন অর্থনীতিবিদ্ **কেইন্‌স** (Keynes) দেশে অতিরিক্ত চাহিদা সৃষ্টির মাধ্যমে মন্দাবস্থা দূর করার ক্ষেত্রে সরকারি ব্যয়ের গুরুত্বের উপর জোর দেন। এইভাবে দেশের অর্থনৈতিক ক্রিয়াকলাপে সরকারি হস্তক্ষেপের গুরুত্ব স্বীকৃত হয়।

২.৩.১. মিশ্র অর্থব্যবস্থার বৈশিষ্ট্য (Characteristics of mixed economic system)

বর্তমানে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে যে মিশ্র অর্থব্যবস্থা লক্ষ্য করা যায়, তার বৈশিষ্ট্যগুলি নিম্নরূপ ঃ

(১) ধনতান্ত্রিক ও সমাজতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থার বৈশিষ্ট্যের সহাবস্থান ;

(২) সরকারি এবং বেসরকারি ক্ষেত্রের সহাবস্থান ;

(৩) সরকারি নিয়ন্ত্রণসহ উদ্যোগের স্বাধীনতা ;

(৪) বাজার-ব্যবস্থা এবং কেন্দ্রীয় পরিকল্পনার সহাবস্থান ;

(৫) ব্যক্তিগত সম্পত্তির অধিকার এবং সরকারি নিয়ন্ত্রণবিধির সহাবস্থান ইত্যাদি।

মিশ্র অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় একদিকে থাকে বিরাট বেসরকারি ক্ষেত্র, যেখানে উৎপাদন সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে উৎপাদকেরা বাজার-নির্ধারিত দ্রব্যমূল্যের উপর নির্ভর করে। আবার, সেখানে ভোক্তারাও তাদের ক্রয়-ক্ষমতা অনুসারে খোলা বাজার থেকে বাজারদামে বিভিন্ন দ্রব্যসামগ্রী ক্রয় করতে সক্ষম। কাজেই, বেসরকারি ক্ষেত্রে উৎপাদক ও ভোক্তারা যথেষ্ট সার্বভৌমত্ব ভোগ করে।

অন্যদিকে, দেশে প্রতিরক্ষা, প্রশাসন, আমদানি-রপ্তানি বাণিজ্য, শিল্প, ব্যাংকিং ও বিমা ইত্যাদি বিভিন্ন ক্ষেত্রে সরকারি পরিচালনা ও নিয়ন্ত্রণের অস্তিত্ব থাকে। সরকারি পরিচালনা ও নিয়ন্ত্রণে গড়ে ওঠে নানা শিল্পোদ্যোগ। তাছাড়া, দেশে পরিবহন ও যোগাযোগ, বিদ্যুৎ, সেচ প্রভৃতি অর্থনৈতিক পরিকাঠামো (Economic infrastructure) গঠনেও সরকারের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হয়। যেমন — ভারতে কৃষিক্ষেত্রে কৃষকেরা উৎপাদন সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে স্বাধীনতা ভোগ করে ; বেসরকারি শিল্পক্ষেত্রে উদ্যোক্তারা উৎপাদন সিদ্ধান্ত গ্রহণে বা দ্রব্যমূল্য নির্ধারণেও যথেষ্ট স্বাধীনতা ভোগ করে। অন্যদিকে, সরকারি ক্ষেত্রে রেলপথ পরিবহন, বিদ্যুৎ ইত্যাদি যে সকল পরিষেবার সৃষ্টি হয় বা সরকারি শিল্পোদ্যোগগুলিতে যে সকল দ্রব্য উৎপাদিত হয়, তাদের পরিমাণ ও দাম নির্ধারণের ক্ষেত্রে সরকারের প্রাধান্য ও নিয়ন্ত্রণ বজায় থাকে।

ভারতে একই শিল্পে সরকারি ও বেসরকারি উদ্যোগের সহাবস্থান লক্ষ্য করা যায়। যেমন — পরিবহন শিল্পে সরকারি ও বেসরকারি বাসের সহাবস্থান দেখা যায়।

সম্পত্তির ব্যক্তিগত মালিকানার অধিকার স্বীকৃত হলেও এই অর্থব্যবস্থায় এইগুলির উপর ক্ষেত্র-বিশেষে সরকারি নিয়ন্ত্রণ বিধি প্রযোজ্য হয়। যেমন — কৃষিক্ষেত্রে ভূ-সম্পত্তির ব্যক্তিগত মালিকানা স্বীকৃত হলেও সরকার জোতজমির (Land holding) সর্বোচ্চ সীমা বেঁধে দিতে পারে। যেমন, ভারতে ভূমি-সংস্কার আইনে পরিবার পিছু জোতজমির সর্বোচ্চ সীমা বেঁধে দেওয়া আছে। বেসরকারি শিল্পক্ষেত্রে উদ্যোক্তাদের স্বাধীনতা থাকলেও, নানা ধরনের শিল্প লাইসেন্স এবং বিধি-নিষেধের মাধ্যমে সরকার বেসরকারি উদ্যোক্তাদের কার্যকলাপ নিয়ন্ত্রণ করে। এই ধরনের অর্থব্যবস্থায় অর্থনীতির মূল সমস্যাগুলির সমাধান একাধারে মুক্ত দাম ব্যবস্থা এবং সরকারের পরিকল্পনা দপ্তরের মাধ্যমে করা হয়।

২.৩.২. মিশ্র অর্থব্যবস্থায় পরিকল্পনা (Planning in a mixed economic system)

এইরূপ অর্থব্যবস্থায় পরিকল্পনা রচিত হলেও সেই পরিকল্পনা মূলত উৎসাহমূলক ও উন্নয়নমুখী পরিকল্পনা। অর্থাৎ, সেই পরিকল্পনায় অর্থনীতির বিভিন্ন ক্ষেত্রে উন্নয়নের লক্ষ্যমাত্রা ধার্য করা হয় এবং পরিকল্পনার উদ্দেশ্যগুলি বাস্তবে রূপায়ণ করার জন্য সরকার বিভিন্ন ক্ষেত্রে উদ্যোক্তাদের নানাভাবে উৎসাহ প্রদান করে। নানা ক্ষেত্রে কর ছাড়ের সুবিধা, সরকারি ভর্তুকি প্রদান, সরকারি ব্যয় বৃদ্ধি ইত্যাদির মাধ্যমে এই ধরনের উৎসাহ সৃষ্টি করা হয়। ভারতেও পরিকল্পনা কমিশনের উদ্যোগে প্রতি পাঁচ বছর অন্তর একটি করে পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়।

সাম্প্রতিককালে অর্থনৈতিক উদারীকরণের পরিপ্রেক্ষিতে অনেক অর্থনীতিবিদ্ ভারতের মতো মিশ্র অর্থব্যবস্থায় পরিকল্পনার নতুন ভূমিকার উপর আলোকপাত করেছেন। তাঁদের মতে উদার অর্থনৈতিক পরিমণ্ডলে বাজার-শক্তিকে অধিকতর গুরুত্ব দেওয়া হলেও ভারতের মতো উন্নয়নশীল দেশে গুরুত্বপূর্ণ সামাজিক মূলধন সরবরাহ, প্রতিরক্ষা, প্রশাসন প্রভৃতি ক্ষেত্রে সরকারি নিয়ন্ত্রণ বজায় রাখতেই হবে। অন্যদিকে, পরিকল্পনা রচনার ক্ষেত্রে সরকারি বিনিয়োগ-পরিকল্পনার গুরুত্ব কমিয়ে বেসরকারি ক্ষেত্রের উন্নয়ন-সম্ভাবনা নির্দেশ ও তাদের উৎসাহ প্রদানের উপরেই অধিক গুরুত্ব আরোপ করার কথা বলা হয়েছে। কাজেই, মিশ্র অর্থনীতিতেও পরিকল্পনার গুরুত্ব একেবারে অস্বীকার করা যায় না। এই বিষয়ে আমরা এয়োদশ অধ্যায়ে আলোচনা করব।

১·২· অর্থনীতির আলোচনা পদ্ধতি :

অর্থনীতি একটি শাস্ত্র বা বৈজ্ঞানিক বিষয়। এর আলোচনার ভাষা পুরোপুরি কথ্য বা লেখ্য ভাষা নয়। যে-কোন বৈজ্ঞানিক বিষয়ের ভাষা হবে তর্কশাস্ত্রসম্মত ভাষা, যার সাহায্যে সংক্ষেপে ও সহজে অনেক কথা বলা যায়। এই ভাষার নাম অঙ্ক। কাজেই অর্থনীতিতে যে অঙ্কের ব্যাপক ব্যবহার থাকবে—সে সম্বন্ধে কোন সন্দেহই নেই। অঙ্কের বহু শাখা যেমন—জ্যামিতি, বীজগণিত, অবকলন ও সমাকলন গণিত ইত্যাদি। সাধারণ স্নাতক স্তরের আলোচনায় খুব বেশি অঙ্ক ব্যবহার করা হয় না। সবচেয়ে বেশি ব্যবহার হয় জ্যামিতির, বিশেষ করে স্থানাঙ্ক জ্যামিতির। আমাদের এই পাঠ্য পুস্তকে জ্যামিতিক পদ্ধতির আশ্রয় নেওয়া হয়েছে সবচেয়ে বেশি করে। জ্যামিতিক পদ্ধতিতে রেখাচিত্র ও রেখার সাহায্যে আলোচ্য বিষয়ের ব্যাখ্যা করা হয়। আমরা এখানে রেখা ও রেখার ঢাল সম্বন্ধে কয়েকটি কথা বলতে চাই। এই অংশটি ভালো করে পড়লে ছাত্রছাত্রীরা পরের রেখাচিত্রগুলি সহজে বুঝতে পারবে বলে আশা করি।

(ক) রেখাচিত্র ও রেখা :

সাধারণ রেখাচিত্রে দুটি অক্ষ থাকে; যথা: OX-অক্ষ ও OY-অক্ষ। OX-অক্ষে X নামক একটি বিষয় বা চলমান (Variable) এবং OY-অক্ষে Y নামক একটি বিষয় বা চলমান পরিমাপ করা হয়। আমরা যদি ধরে নিই যে, Y নামক বিষয়টি X নামক বিষয়ের উপর নির্ভর করে তাহলে আমরা $Y=f(X)$ নামক একটি অপেক্ষক (Function) পাই। এই অপেক্ষকের মধ্যে X-এর বিভিন্ন মান বসিয়ে Y-এর বিভিন্ন মান পাই। যেমন, যদি $Y=3X$ হয়, তাহলে যখন $X=1, 2, 3, 4, 5$ ইত্যাদি হবে তখন $Y=3, 6, 9, 12, 15$ ইত্যাদি হবে।

আবার অপেক্ষক যদি $Y=3X+4$ (অর্থাৎ Y-এর মান X-এর মানের তিনগুণের চেয়ে 4 বেশি) হয়

তাহলে যখন $X=1, 2, 3, 4, 5$ ইত্যাদি হবে

তখন $Y=7, 10, 13, 16, 19$ ইত্যাদি হবে

অর্থাৎ, আমরা যদি Y ও X-এর সম্পর্কটিকে একটি সমীকরণের আকারে পাই, তাহলে সেই সমীকরণে X-এর বিভিন্ন মান বসিয়ে Y-এর বিভিন্ন মান পাই। X-এর একটি মান এবং সমীকরণ থেকে লব্ধ Y-এর একটি মান—এই দুটি মানকে আমরা রেখাচিত্রের মধ্যে একটি বিন্দু দ্বারা প্রকাশ করে থাকি।

এইরকমভাবে X ও Y-এর বিভিন্ন সমন্বয় (Combination) থেকে আমরা রেখাচিত্রের মধ্যে একাধিক বিন্দু পাই। সেই বিন্দুগুলির মধ্যে দিয়ে একটি রেখা অঙ্কন করা যায়। সেই রেখার সাহায্যে X ও Y নামক দুটি বিষয়ের পরিমাণগত সম্পর্ক দেখানো যায়।

অতএব—রেখা হল X ও Y নামক যে-কোন দুটি বিষয়ের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত সম্পর্কের একটি জ্যামিতিক চিত্ররূপ।

রেখা দুরকমের হয়, যথা—সরলরেখা ও বক্ররেখা। প্রথমে সরলরেখার কথা বলা যেতে পারে। যেখানে $Y=f(X)$ নামক অপেক্ষকটিতে X ও Y একটি নির্দিষ্ট পরিমাণগত সম্পর্কে আবদ্ধ হয়, যাতে X-এর পরিবর্তনের ফলে Y-এর পরিবর্তনের হার সর্বদা সমান থাকে, তখন X ও Y-এর সম্পর্কটিকে একটি সরলরেখার দ্বারা প্রকাশ করা যায়। অন্যভাবে বলা যায়—যেখানে X-এর পরিবর্তনের ফলে Y-এর পরিবর্তনের হার সমান থাকবে তখন X ও Y একটি সরলরেখার উপর থাকবে।

অপরপক্ষে X-এর পরিবর্তনের ফলে Y-এর পরিবর্তনের হার যদি সব সময় এক রূপ না থাকে, এখন একরকম, তখন অন্যরকম হয়, তাহলে X ও Y একটি সরলরেখার উপর থাকবে না ; তারা একটি বক্ররেখার উপর থাকবে। তাহলে আমরা পাই—

(১) যখন X ও Y-এর পরিবর্তন সমান হারে হয় তখন X ও Y-এর বিভিন্ন মান একটি সরলরেখার উপর থাকবে।

(২) যখন X ও Y-এর পরিবর্তন অসমান হারে হয় তখন X ও Y-এর বিভিন্ন মান একটি বক্ররেখার উপর থাকে।

সরলরেখা উর্ধ্বমুখী, নিম্নমুখী কিংবা যে-কোন একটি অক্ষের সমান্তরাল হতে পারে। আমরা এখানে নিম্নলিখিত মন্তব্যগুলি করতে পারি—

(১) যদি X বাড়লে Y বাড়ে, কিংবা X কমলে Y কমে, তাহলে X ও Y উর্ধ্বমুখী সরলরেখার উপর থাকবে। এখানে X ও Y-এর সম্পর্ক একমুখী হবে।

(২) যদি X বাড়লে Y কমে কিংবা X কমলে Y বাড়ে, তাহলে X ও Y নিম্নমুখী সরলরেখার উপর থাকবে। এখানে X ও Y-এর সম্পর্ক বিপরীতমুখী হবে।

(৩) যদি X বাড়লে বা কমলে Y একটি নির্দিষ্ট স্তরে স্থির থাকে তাহলে X ও Y-এর সম্পর্ক OX-অক্ষের সমান্তরাল একটি রেখার দ্বারা বোঝানো যাবে।

(৪) যদি X একটি নির্দিষ্ট স্তরে স্থির থাকে কিন্তু Y বেড়ে যায় বা কমে যায়, তাহলে X ও Y-এর মানগুলি OY-অক্ষের সমান্তরাল একটি সরলরেখার উপর থাকবে।

সরলরেখার মত বক্র রেখাও উর্ধ্বমুখী বা নিম্নমুখী হতে পারে। X ও Y-এর একমুখী সম্পর্ক থেকে উর্ধ্বমুখী বক্ররেখা পাওয়া যায় এবং X ও Y-এর বিপরীতমুখী সম্পর্ক থেকে নিম্নমুখী রেখা পাওয়া যায়। আবার একটি বক্ররেখা OX-অক্ষের দিকে উত্তল (Convex) বা অবতল (Concave) হতে পারে। এর দ্বারা কী বোঝায় ? এই প্রশ্নের উত্তর দিতে হলে আমাদের ঢাল (Slope) সম্বন্ধে জানতে হবে।

(খ) ঢাল (Slope) কাকে বলে ?

ধরা যাক, Y নামক বিষয়টি X নামক বিষয়ের উপর নির্ভর করে। তাহলে আমরা পাই $Y=f(X)$। এখানে Y হল নির্ভরশীল বিষয় (dependent variable) এবং X হল স্বাধীন বিষয় (independent variable)। তাহলে X-এর পরিবর্তন হলে Y-এর পরিবর্তন হবে। ধরা যাক, X-এর মান $\triangle X$ পরিমাণে বৃদ্ধি পেল এবং তার ফলে Y-এর মান $\triangle Y$ পরিমাণে বৃদ্ধি পেল।* তাহলে আমরা $\frac{\triangle Y}{\triangle X}$ নামক একটি অনুপাত পাব। এই অনুপাতের

* $\triangle$ (ডেল্টা) হল একটি গ্রীক অক্ষর। কোন বিষয়ের পরিবর্তন বোঝাতে $\triangle$ ব্যবহৃত হয়। X-এর পরিবর্তন হল $\triangle X$ এবং Y-এর পরিবর্তন হল $\triangle Y$. পরিবর্তন বলতে হ্রাস (ঋণাত্মক পরিবর্তন) বা বৃদ্ধি (ধনাত্মক পরিবর্তন) বোঝায়।

অর্থ কী ? আমরা লক্ষ্য করতে পারি যে,

যখন X বাড়ে ΔX পরিমাণে তখন Y বাড়ে ΔY পরিমাণে,

যখন X ,, 1 একক ,, ,, Y ,, $\frac{\Delta X}{\Delta Y}$,,

অতএব $\frac{\Delta Y}{\Delta X}$ =X-এর প্রতি একক বৃদ্ধির জন্য Y-এর বৃদ্ধি।

(33)

ধরা যাক, X কমলে Y কমে। তাহলে $\frac{\Delta Y}{\Delta X}$ হবে X-এর প্রতি একক হ্রাসের জন্য Y-এর হ্রাস। হ্রাস বা বৃদ্ধি যে-কোন একটিকে বোঝাবার জন্য আমরা পরিবর্তন (change) শব্দটির ব্যবহার করতে পারি।

তাহলে $\frac{\Delta Y}{\Delta X}$ হবে X-এর প্রতি একক পরিবর্তনের জন্য Y-এর পরিবর্তন। গণিতে একে বলা হয় Y-এর পরিবর্তনের হার এবং জ্যামিতিতে বলা হয় ঢাল (slope)। অতএব ঢাল হল **স্বাধীন বিষয়ের এক একক পরিবর্তনের জন্য নির্ভরশীল বিষয়ের পরিবর্তন, কিংবা স্বাধীন বিষয়ের পরিবর্তনের ফলে নির্ভরশীল বিষয়ের পরিবর্তনের হার। যদি X ও Y যথাক্রমে স্বাধীন ও নির্ভরশীল বিষয় হয়ে থাকে তাহলে ঢাল=$\frac{\Delta Y}{\Delta X}$ হবে।**

(গ) কীভাবে ঢাল পরিমাপ করা হয় ?

প্রথমে সরলরেখার ঢাল পরিমাপ করা হবে। ধরা যাক, সরলরেখাটি হল ১·১ নং চিত্রে অঙ্কিত AB রেখার মত একটি ঊর্ধ্বমুখী সরলরেখা।

এখানে OX-অক্ষে X নামক স্বাধীন বিষয়টি এবং OY-অক্ষে Y নামক নির্ভরশীল বিষয়টি পরিমাপ করা হয়েছে। এখন আমরা AB রেখার ঢাল পরিমাপ করতে চাই।

তার জন্য AB রেখার উপর C ও D নামক দুটি বিন্দু নিলাম এবং CDE ত্রিভুজটি অঙ্কন করলাম।

এখন C থেকে D বিন্দুতে সরে গেলে X ও Y-এর মান বাড়বে।

এখানে CE=X-এর বৃদ্ধি=ΔX এবং ED=Y-এর বৃদ্ধি=ΔY ;

অতএব AB রেখার ঢাল হবে $\frac{\Delta Y}{\Delta X}=\frac{DE}{CE}$

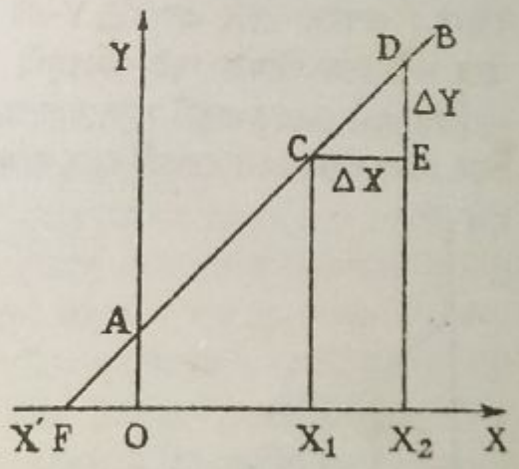

১·১ রেখাচিত্র : সরলরেখার ঢাল

দেখা যাচ্ছে, CDE ত্রিভুজটি একটি সমকোণী ত্রিভুজ। CE হল এর ভূমি এবং DE হল এর লম্ব।

কাজেই $\frac{\Delta Y}{\Delta X}=\frac{DE}{CE}$=CDE ত্রিভুজের $\frac{\text{লম্ব}}{\text{ভূমি}}$।

ত্রিকোণমিতিতে $\frac{DE}{CE}$ হল ∠DCE-এর ট্যান্‌জেন্ট্ নামক একটি অনুপাত।

ধরা যাক, DCE হল X°. তাহলে আমরা পাই $\frac{\triangle Y}{\triangle X}=\frac{DE}{CE}=\tan X^\circ$

আবার, AB রেখাটিকে যদি বাম দিকে বর্ধিত করা যায় তাহলে ঐ রেখাটি OX-অক্ষকে বাম দিকের সম্প্রসারিত অংশের F বিন্দুতে ছেদ করবে এবং সেখানে $\angle AFO$ নামক একটি কোণ তৈরি করবে। এখন $\angle AFO=\angle DCE$ (কারণ ওরা অনুরূপ কোণ)। কাজেই $\angle DCE=X^\circ$ হলে $\angle AFO=X^\circ$ হবে। তাহলে AB নামক সরলরেখার ঢাল হবে $\tan X^\circ$. **অতএব কোন উর্ধ্বমুখী সরলরেখাকে যদি বাম দিকে সম্প্রসারিত করা যায় তাহলে সেই রেখাটি OX-অক্ষের বামদিকের সম্প্রসারিত অংশে যে কোণ উৎপন্ন করবে সেই কোণের ট্যান্‌জেন্ট হবে সেই সরলরেখার ঢাল।**

এই প্রসঙ্গে আর একটি কথা বলা উচিত। সরলরেখার ক্ষেত্রে X-এর সমান সমান পরিবর্তনের জন্য Y-এর পরিবর্তনও সমান হারে হয়ে থাকে। কাজেই সরলরেখার উপর যে-কোন স্থানে যে-কোন দুটি বিন্দু নিলে ঢালের কোন পরিবর্তন হবে না। অর্থাৎ **সরলরেখার ঢাল সর্বত্র সমান বা স্থির থাকে।**

১·১ নং রেখাচিত্রে AB একটি উর্ধ্বমুখী সরলরেখা।

এখানে X বাড়লে (অর্থাৎ $\triangle X$ ধনাত্মক হলে) Y বাড়ে ($\triangle Y$ ধনাত্মক হয়), কাজেই $\frac{\triangle Y}{\triangle X}$ ধনাত্মক হবে।

আবার, X কমলে $\triangle X$ ঋণাত্মক হবে এবং তখন Y কমবে অর্থাৎ $\triangle Y$ ঋণাত্মক হবে, কাজেই $\frac{\triangle Y}{\triangle X}$ ধনাত্মক হবে।

কাজেই **উর্ধ্বমুখী রেখার ক্ষেত্রে ঢাল হবে ধনাত্মক।** কিন্তু AB রেখাটি যদি ১·২ নং চিত্রে অঙ্কিত রেখার মত নিম্নমুখী সরলরেখা হয়, তাহলে X বাড়লে Y কমবে এবং X কমলে Y বাড়বে। এখানে $\triangle X$ এবং $\triangle Y$-এর পরিবর্তন বিপরীতমুখী হওয়ায় $\frac{\triangle Y}{\triangle X}$ ঋণাত্মক হবে। তাহলে আমরা পাই—**নিম্নমুখী রেখার ঢাল ঋণাত্মক।**

কিন্তু AB যেহেতু একটি সরলরেখা, অতএব এর ঢালের কোন পরিবর্তন হবে না। ১·২ নং চিত্রে দেখা যাচ্ছে AB রেখাটি OX-অক্ষকে B বিন্দুতে ছেদ করেছে এবং m^0 কোণ সৃষ্টি করেছে। কাজেই AB রেখার ঢাল হবে $\tan m^0$.

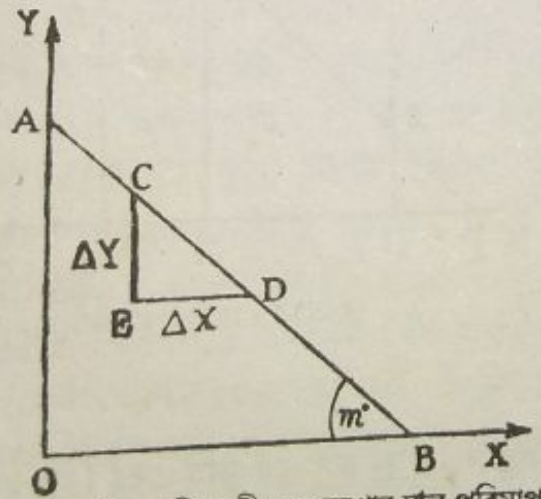

১·২ রেখাচিত্র : নিম্নমুখী সরলরেখার ঢাল পরিমাপ

এখানে $\tan m^0 = OAB$ নামক ত্রিভুজের $\frac{\text{লম্ব}}{\text{ভূমি}}=\frac{OA}{OB}$.

এই রেখার উপর C ও D বিন্দু নিলে দেখা যাবে

$$\text{ঢাল}=\frac{\triangle Y}{\triangle X}=\frac{CE}{ED}=\tan CDE \text{ কোণ।}$$

কিন্তু $\angle CDE=\angle ABO=m^0$.

$$\text{অতএব ঢাল}=\frac{CE}{ED}=\tan m^0=\frac{OA}{OB}.$$

(ঘ) **বক্ররেখার ঢাল কীভাবে পরিমাপ করা যায়?**

বক্ররেখার ক্ষেত্রে X এবং Y-এর পরিবর্তন সমান হারে হয় না, কাজেই সেখানে ঢাল $=\frac{\triangle Y}{\triangle X}$ হবে না। ঢাল হল X-এর পরিবর্তনের জন্য Y-এর পরিবর্তনের হার। X-এর

পরিবর্তন যদি খুব বেশি পরিমাণে হয়, তাহলে ΔX খুব বড়ো (lumpy) হয় এবং ΔYও খুব বড়ো হয়। কিন্তু আমরা যখন বক্ররেখার ঢাল পরিমাপ করব তখন ΔX ও ΔY খুব হয়ে গেলে Y-এর পরিবর্তনের গড় হার পাওয়া যাবে, প্রকৃত হার পাওয়া যাবে না। যেমন, কোন ট্রেন যদি দু-ঘণ্টায় ৫০ কি·মি· পথ যায় তাহলে তার গতিবেগ হবে প্রতি ঘণ্টায় গড়ে ২৫ কি·মি·। কিন্তু একটি ঘণ্টার মধ্যে ৬০টি মিনিট থাকে, সেই মিনিটগুলির প্রত্যেকটিতে গাড়ির গতিবেগ কত ছিল তা কখনই প্রতি ঘণ্টার গড় গতি থেকে জানা যাবে না। গাড়ির প্রকৃত গতিবেগ নির্ধারণ করতে হলে আমাদের সময়কে অতি সূক্ষ্ম ভাগে বিভাজ্য ধরে নিয়ে তার অতিশয় ক্ষুদ্র পরিবর্তনের জন্য গাড়ি যে অতিরিক্ত ক্ষুদ্র দূরত্ব অতিক্রম করে তাকেই বোঝাতে হবে।

অনুরূপভাবে বক্ররেখার ঢাল পরিমাপ করতে হলে $\frac{\Delta Y}{\Delta X}$ পরিমাপ করলে হবে না। এক্ষেত্রে $\frac{\Delta Y}{\Delta X}$ দিয়ে ঢাল মাপলে কী রকম ভুল হতে পারে সেটা ১·৩ নং রেখাচিত্রে দেখানো হল।

ধরা যাক, PQ একটি বক্ররেখা। এর উপর A ও B নামে দুটি বিন্দু নেওয়া হল। ABC সমকোণী ত্রিভুজটি অঙ্কিত হল।

এখানে A থেকে B বিন্দুতে সরে গেলে $\Delta X = AC$ এবং $\Delta Y = BC$ হয়।

অতএব $\frac{\Delta Y}{\Delta X} = \frac{BC}{AC}$ হয়।

কিন্তু $\frac{BC}{AC}$ হল BAC কোণের।

ট্যান্‌জেন্ট = AB সরলরেখার ঢাল।

কিন্তু $\frac{BC}{AC}$ কখনই ADB চাপের বা

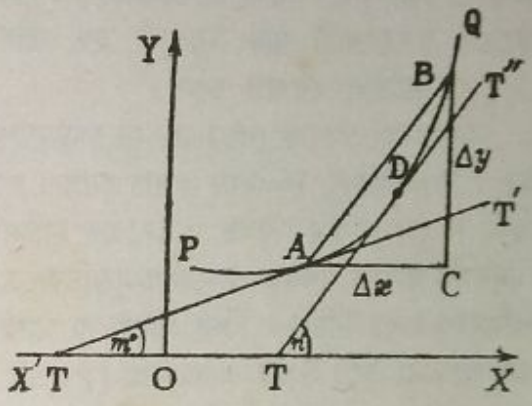

১·৩ রেখাচিত্র : বক্ররেখার ঢাল পরিমাপ

বক্ররেখার ঢাল নয়। ADB রেখাটি AB রেখার নীচে আছে। আমরা যদি ADB রেখার ঢাল বলতে AB রেখার ঢাল বলে থাকি তাহলে আমরা ঢালের যে পরিমাপ পাই সেটি প্রকৃত ঢালের চেয়ে বেশি হয়ে যাবে। ব্যাপারটাতে ভুল থেকে যাবে। আবার, PQ রেখাটি যদি OX-অক্ষের দিকে উত্তল না হয়ে অবতল হত, তাহলে AB রেখার ঢাল দ্বারা ADB বক্ররেখার ঢাল পরিমাপ করলে আমাদের পরিমাপ প্রকৃত ঢালের চেয়ে কম হত।

এই ভুল এড়ানোর উপায় হল A এবং B বিন্দু দুটিকে খুব কাছাকাছি রাখা। তাহলে AB প্রায় একটি সরলরেখা হয়ে যাবে। সেক্ষেত্রে AB রেখার ঢালই হবে বক্ররেখার ঢালের আসন্ন প্রকৃত মান। A ও B বিন্দুকে কাছাকাছি রাখার জন্য আমরা A বিন্দুকে স্থির রেখে B বিন্দুকে A বিন্দুর দিকে নামিয়ে আনতে পারি। যতই এরকম করা হবে ততই ΔX কমবে। এভাবে যখন ΔX খুবই ছোট হয়ে যাবে (প্রায় শূন্যের কাছাকাছি), তখন আমরা বলতে পারব ΔX শূন্যের দিকে যায় (ΔX tends to zero), অবশেষে $\frac{\Delta Y}{\Delta X}$ এমন একটি মান পাবে যাকে আমরা সীমা বা Limit বলতে পারি। একে $\frac{dy}{dx}$ লেখা হয়। তাহলে বক্ররেখার ঢাল হবে $\underset{\Delta X \to 0}{\text{Lim}} \frac{\Delta Y}{\Delta X} = \frac{dy}{dx}$. জ্যামিতিক ভাবে বলা যায় $\frac{dy}{dx}$ হল বক্ররেখার উপর নির্দিষ্ট বিন্দুতে অঙ্কিত স্পর্শকের ঢাল। ধরা যাক PQ বক্ররেখার উপর A বিন্দুতে ঢাল

পরিমাপ করতে হবে। তাহলে আমরা PQ রেখার উপর A বিন্দুতে TT' নামক একটি স্পর্শক অঙ্কন করতে পারি। এই স্পর্শকটি একটি সরলরেখা এবং এটি OX-অক্ষের বাম দিকের বর্ধিত অংশে m^0 কোণ উৎপন্ন করে। তাহলে TT' রেখার ঢাল tan m^0 হবে PQ বক্ররেখার A বিন্দুতে PQ রেখার ঢাল। অনুরূপভাবে আমরা যদি PQ রেখার উপর D বিন্দুতে ঢাল পরিমাপ করতে চাই তাহলে আমাদের PQ রেখার D বিন্দুতে TT" নামক আর একটি স্পর্শক অঙ্কন করতে হবে। সেই স্পর্শকের ঢালই হবে PQ রেখার D বিন্দুতে PQ রেখার ঢাল।

আমাদের ১·৩ নং রেখাচিত্রে TT" স্পর্শকটি OX-অক্ষের উপর n° কোণ উৎপন্ন করে। TT" স্পর্শকের ঢাল হবে tan n°. তাহলে আমরা পাই—

বক্ররেখার উপর কোন বিন্দুতে স্পর্শক অঙ্কন করলে সেই স্পর্শকটি OX-অক্ষের উপর যে কোণ উৎপন্ন করে সেই কোণের ট্যানজেন্ট্ হবে সেই বিন্দুতে সেই বক্ররেখার ঢাল।

এর থেকে আর একটি ব্যাপার বোঝা যায়। **বক্ররেখার উপর বিভিন্ন বিন্দুতে ঢাল বিভিন্ন হয়।** বক্ররেখাটি যদি ঊর্ধ্বমুখী হয় তাহলে ঢাল ধনাত্মক হয় এবং বক্ররেখাটি যদি OX-অক্ষের দিকে উত্তল হয়, তাহলে সেই রেখার উপর বাম দিকের কোন বিন্দু থেকে ডান দিকের কোন বিন্দুতে ঢাল বৃদ্ধি পায়। বক্ররেখাটি যদি OX-অক্ষের দিকে অবতল হয়, তাহলে ঢাল ক্রমশ কমে। বক্ররেখাটি যদি নিম্নমুখী হয়, তাহলে ঢাল ঋণাত্মক হয়।

(ঙ) চাহিদা রেখার ঢাল ঃ

চাহিদা-অপেক্ষকে কোন দ্রব্যের চাহিদাকে সেই দ্রব্যের দামের উপর নির্ভরশীল বলে ধরা হয়। D=চাহিদা, P=দাম ধরলে আমরা পাই D=f(P), এখানে D হল নির্ভরশীল বিষয় এবং P হল স্বাধীন বিষয়। অতএব চাহিদা রেখা অঙ্কন করার সময় অঙ্কের প্রচলিত রীতি অনুযায়ী স্বাধীন বিষয় P-কে অনুভূমিক অক্ষে এবং নির্ভরশীল বিষয় D-কে উল্লম্ব অক্ষে পরিমাপ করা উচিত। কিন্তু অধ্যাপক মার্শাল চাহিদা রেখা অঙ্কন করার সময় এই রীতিটি অনুসরণ না করে উল্লম্ব অক্ষে দাম (P) এবং অনুভূমিক অক্ষে চাহিদা (D) পরিমাপ করেন। এতে ঢালের জ্যামিতিক পরিমাপ নির্ণয় করার সময় চাহিদা রেখা উল্লম্ব অক্ষে যে কোণ উৎপন্ন করে তার ট্যানজেন্ট পরিমাপ করতে হয়। কারণ চাহিদা রেখার

$$\text{ঢাল} = \frac{\Delta D}{\Delta P} = \frac{\text{অনুভূমিক দূরত্ব}}{\text{লম্ব দূরত্ব}} \text{ হবে।}$$

আমাদের ১·৪ নং রেখাচিত্রে এটি দেখানো হয়েছে। এখানে AB হল একটি সরলরৈখিক চাহিদা রেখা। এর উপর C ও D নামক দুটি বিন্দু নেওয়া হল এবং CED ত্রিভুজটি অঙ্কন করা হল।

এখানে $\Delta D = ED$, এবং $\Delta P = CE$.

তাহলে AB চাহিদা রেখার ঢাল

$$= \frac{\Delta D}{\Delta P} = \frac{DE}{CE}.$$

কিন্তু $\frac{DE}{CE}$ হল CED সমকোণী ত্রিভুজের $\frac{\text{ভূমি}}{\text{লম্ব}} = \frac{1}{\frac{\text{লম্ব}}{\text{ভূমি}}} = \frac{1}{\tan \angle CDE}$

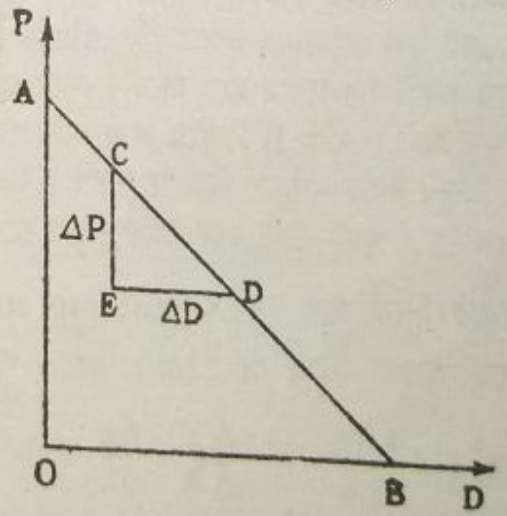

১·৪ রেখাচিত্র : চাহিদা রেখার ঢাল পরিমাপ

অর্থাৎ CDE কোণের ট্যানজেন্টের অন্যোন্যক হল AB চাহিদা রেখার ঢাল।

■ ১.৭. মূল প্রতিযোগিতার মডেল (The Basic Competitive Model)

বাজারে দুই ধরনের অংশগ্রহণকারী বর্তমান। একটি হল উৎপাদক শ্রেণী (Producers) এবং অপরটি হল ভোগকারী (Consumers)। প্রতিযোগিতার বাজারে অসংখ্য ক্রেতা ও বিক্রেতা বর্তমান থাকায় তারা নিজেদের মধ্যে প্রতিযোগিতা করে থাকে। উৎপাদকরা যথাযথ দ্রব্য সম্ভবপর সর্বাপেক্ষা কম দামে ক্রেতাদের প্রদান করে নিজেদের মধ্যে প্রতিযোগিতা করে থাকে। অপরপক্ষে ক্রেতারা যে দ্রব্য কিনতে ইচ্ছুক তার জন্য সর্বাপেক্ষা কম দাম দিতে সচেষ্ট থাকে। আবার অনেকের দ্রব্যটি কেনার ক্ষমতা নাও থাকতে পারে। এই ধরনের পরিস্থিতিকেই বলা হয় **মূল প্রতিযোগিতার মডেল** (Basic Competitive Model)।

মূল প্রতিযোগিতার মডেলে বিক্রেতা মুনাফা সর্বাধিকরণ (Profit maximisation) নীতির দ্বারা পরিচালিত হয়। অপরপক্ষে ক্রেতারা হল যুক্তিবাদী (rational) বা নিজেদের স্বার্থ সচেতন এবং বাজারটি হল পূর্ণাঙ্গ প্রতিযোগিতামূলক বাজার।

যে বাজারে অসংখ্য ক্রেতা ও বিক্রেতা পরস্পর প্রতিযোগিতার মাধ্যমে একটি সমজাতীয় দ্রব্য কেনাবেচা করে সেই বাজারকে পূর্ণাঙ্গ প্রতিযোগিতামূলক বাজার বলে।

● **১.৭.১. পূর্ণাঙ্গ প্রতিযোগিতামূলক বাজারে চাহিদা ও যোগান দ্বারা বাজার দাম নির্ধারণ (Price Determination in a Perfectly Competitive Market by Demand and Supply) :** পূর্ণাঙ্গ প্রতিযোগিতামূলক বাজারে অসংখ্য ক্রেতা ও বিক্রেতা থাকায় ব্যক্তিগতভাবে প্রতিটি ক্রেতা ও বিক্রেতা দামগ্রহীতা। সেইজন্য পূর্ণাঙ্গ প্রতিযোগিতামূলক বাজারে দ্রব্যের বাজার দাম নির্ধারিত হয়ে থাকে ঐ দ্রব্যের বাজার চাহিদা (Market demand) বা সমষ্টিগত চাহিদা ও বাজার যোগানের (Market supply) বা সমষ্টিগত যোগানের ঘাত-প্রতিঘাতে।

প্রতিটি ক্রেতার ব্যক্তিগত চাহিদা রেখা থেকে জানা যায় ঐ ক্রেতা বিভিন্ন দামে কী পরিমাণ দ্রব্য কিনতে চায়। বিভিন্ন ক্রেতার ব্যক্তিগত চাহিদা রেখার যোগফলই হল বাজার চাহিদা রেখা। এই বাজার চাহিদা রেখা ব্যক্তিগত চাহিদা রেখার মতো ডানদিকে নিম্নমুখী হয়। অর্থাৎ দাম কমলে বাজারে মোট চাহিদা বাড়ে এবং দাম বাড়লে বাজারে মোট চাহিদা কমে।

অপরপক্ষে ফার্মের যোগান রেখা থেকে জানা যায়, ঐ ফার্মটি বিভিন্ন দামে কী পরিমাণ দ্রব্য যোগান দেবে। বিভিন্ন ফার্মের যোগান রেখার যোগফলই হল বাজার যোগান রেখা। এই বাজার যোগান রেখা ব্যক্তিগত যোগান রেখার মতো ডানদিকে ঊর্ধ্বমুখী হয়। অর্থাৎ দাম কমলে বাজারে মোট যোগান কমে এবং দাম বাড়লে বাজারে মোট যোগান বাড়ে।

পূর্ণাঙ্গ প্রতিযোগিতার বাজারে ভারসাম্য দাম বা বাজার দাম নির্ধারিত হয় বাজার চাহিদা ও বাজার যোগানের ঘাত-প্রতিঘাতে। **যে দামে বাজারের মোট চাহিদা (বা বাজার চাহিদা) এবং মোট যোগান (বা বাজার যোগান) সমান হয়, সেই দামকে বলে ভারসাম্য দাম বা বাজার দাম।** পূর্ণাঙ্গ প্রতিযোগিতামূলক বাজারে কীভাবে ভারসাম্য দাম নির্ধারিত হয়, তা ১.১৭ নং চিত্রের মাধ্যমে ব্যাখ্যা করা হচ্ছে।

১.১৭ নং চিত্রে অনুভূমিক অক্ষে চাহিদা ও যোগানের পরিমাণ এবং উল্লম্ব অক্ষে দাম পরিমাপ করা হচ্ছে। চিত্রে DD_1 হল বাজার চাহিদা রেখা এবং SS_1 হল বাজার যোগান রেখা। এই দুই রেখা পরস্পর পরস্পরকে E_1 বিন্দুতে ছেদ করেছে। এই E_1 বিন্দুকে বলা হয় ভারসাম্যের বিন্দু। এখানে ভারসাম্য দাম বা বাজার দাম হল

OP_1। কারণ এই দামেই বাজার চাহিদা ও বাজার যোগান সমান হয়েছে। এখানে OM_1 হল ভারসাম্যে দ্রব্য কেনা-বেচার পরিমাণ।

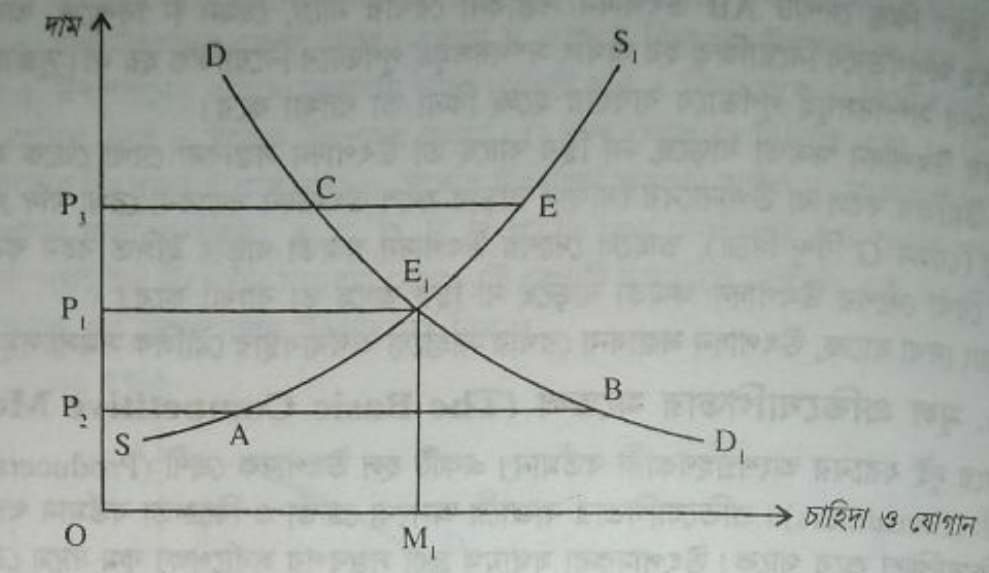

চিত্র ঃ ১.১৭

ভারসাম্য দাম বা বাজার দাম OP_1 না হয়ে যদি OP_2 হয়, তাহলে বিক্রেতারা বাজারে যোগান দেয় P_2A পরিমাণ। কিন্তু ক্রেতাদের মোট চাহিদা হল P_2B, অর্থাৎ AB ($P_2B - P_2A$) হল বাজারে অতিরিক্ত চাহিদার পরিমাণ। ফলে দ্রব্যটির দাম বাড়বে এবং অবশেষে দাম OP_1-এ এসে স্থির হবে। আবার দাম যদি OP_1 না হয়ে OP_3 হয়, তাহলে বিক্রেতারা বাজারে যোগান দেয় P_3E পরিমাণ। কিন্তু ক্রেতাদের মোট চাহিদা হল P_3C। অর্থাৎ CE ($P_3E - P_3C$) হল বাজারে অতিরিক্ত যোগানের পরিমাণ। ফলে দ্রব্যটির দাম কমবে এবং অবশেষে দাম OP_1-তে এসে স্থির হবে। এইভাবে দামের ওঠা-নামার মাধ্যমে বাজার চাহিদা ও বাজার যোগানের সমতা আসে এবং পূর্ণাঙ্গ প্রতিযোগিতামূলক বাজারে দাম নির্ধারিত হয়।

■ ১.৮. দাম নিয়ন্ত্রণ ও বরাদ্দ বণ্টন (Price Control and Rationing)

পূর্ণাঙ্গ প্রতিযোগিতার বাজারে চাহিদা ও যোগানের ঘাত-প্রতিঘাতে দ্রব্যের দাম নির্ধারণ হয়ে থাকে। কিন্তু চাহিদা ও যোগানের ঘাত-প্রতিঘাতে যে দাম নির্ধারিত হয় তা সমাজের দিক দিয়ে গ্রহণযোগ্য নাও হতে পারে। ফলে দেশের সরকার ক্রেতা ও বিক্রেতাদের স্বার্থ রক্ষা করার জন্য দ্রব্যের সর্বোচ্চ বা সর্বনিম্ন দাম বেঁধে দিতে পারে। **সরকার কর্তৃক কোনো দ্রব্যের সর্বোচ্চ বা সর্বনিম্ন দাম নির্ধারণ করে দেওয়াকেই বলা হয় দাম নিয়ন্ত্রণ।**

কোন্ কোন্ পরিস্থিতিতে সরকার একটি দ্রব্যের সর্বোচ্চ দাম বেঁধে দেয় তা এখন আলোচনা করা হচ্ছে। কোনো দ্রব্যের যোগান খুব কমে গেলে বা চাহিদা খুব বেড়ে গেলে বা এই দুটি কারণেই দ্রব্যটির দাম খুব বেড়ে যেতে পারে। এই অবস্থায় ঐ দ্রব্যের বহু ক্রেতার বিশেষ করে দরিদ্র ক্রেতাদের অসুবিধা হতে পারে। এই পরিস্থিতিতে সরকার ক্রেতাদের স্বার্থ রক্ষা করার জন্য দ্রব্যটির সর্বোচ্চ দাম বেঁধে দিতে পারে। সুতরাং সরকার ক্রেতাদের স্বার্থরক্ষার জন্য দ্রব্যের সর্বোচ্চ দাম বেঁধে দেয়। বিষয়টি ১.১৮ নং চিত্রের সাহায্যে ব্যাখ্যা করা হচ্ছে।

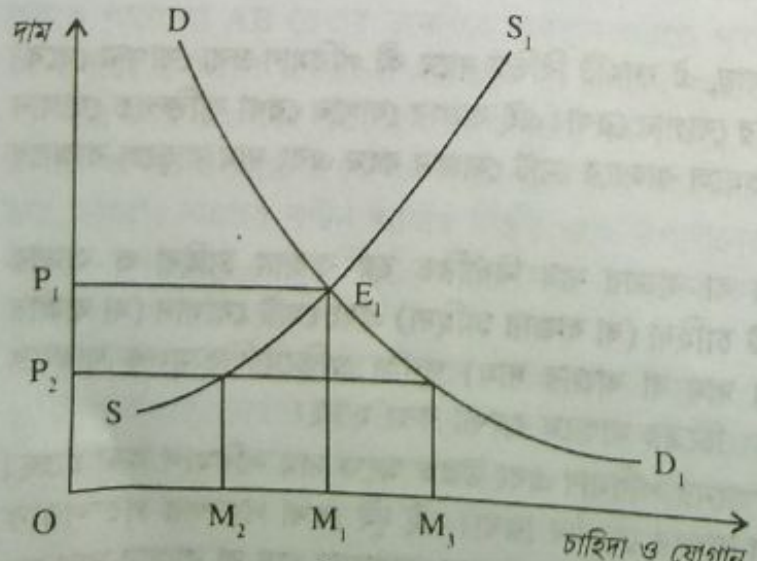

চিত্র ঃ ১.১৮

১.১৮ নং চিত্রে DD_1 বাজার চাহিদা রেখা SS_1 বাজার যোগান রেখাকে E_1 বিন্দুতে ছেদ করায় ঐ বিন্দু হল ভারসাম্যের বিন্দু। এখানে ভারসাম্য দাম বা বাজার দাম হল OP_1 এবং OM_1 হল ভারসাম্য দ্রব্য কেনা-বেচার পরিমাণ। অর্থাৎ বাজারে যদি কোনো রকমের নিয়ন্ত্রণ না থাকে তাহলে বাজারে দাম হবে OP_1। ধরা হচ্ছে বাজার দাম OP_1 খুব বেশি এবং এই দামে

দেশের সাধারণ ক্রেতাদের অসুবিধা হচ্ছে। এই পরিস্থিতিতে সরকার ক্রেতাদের অসুবিধার হাত থেকে রক্ষা করার জন্য বাজার দামকে OP_1 পর্যন্ত বাড়তে না দিয়ে OP_1 অপেক্ষা কম দামে দ্রব্যটির সর্বোচ্চ দাম বেঁধে দিতে পারে। ধরা হচ্ছে সরকার সর্বোচ্চ দাম OP_2 স্তরে বেঁধে দিল। চিত্র থেকে দেখা যাচ্ছে OP_2 দামে দ্রব্যটির চাহিদা হল OM_2, কিন্তু দ্রব্যটির যোগান হল OM_1, অর্থাৎ বাজারে অতিরিক্ত চাহিদা হল M_1M_2। অর্থাৎ বাজারে দ্রব্যটির অভাব থাকবে M_1M_2 পরিমাণ। এই পরিস্থিতিতে দ্রব্যটির বণ্টন সরকার যদি বিক্রেতাদের উপর ছেড়ে দেয়, তাহলে বিক্রেতারা বিভিন্ন পদ্ধতি গ্রহণ করতে পারে দ্রব্যটির বিক্রির জন্য। বিক্রেতারা 'যারা আগে আসবে, তারা আগে পাবে' এই নীতির ভিত্তিতে দ্রব্যটি বিক্রি করতে পারে। অথবা বিক্রেতারা তাদের নিজেদের পছন্দমত পরিচিত ব্যক্তিদের কাছে দ্রব্যটি বিক্রি করতে পারে। কিন্তু বিক্রেতাদের হাতে বিষয়টি ছেড়ে দিলে সমস্ত ক্রেতারা দ্রব্যটি পায় না, ফলে অতিরিক্ত চাহিদার সমস্যা থেকেই যায় এবং দাম বাড়ার প্রবণতাও বর্তমান থাকে। এই পরিস্থিতিতে দ্রব্যটির কালো বাজার সৃষ্টি হতে পারে এবং সরকারের পক্ষে কালো বাজার নিয়ন্ত্রণ করা কঠিন হতে পারে। **কোনো ক্রেতা সরকার নির্দিষ্ট দামের চেয়ে বেশি দাম দিলে বা কোনো বিক্রেতা সরকার নির্দিষ্ট দামের থেকে বেশি দাম নিলে তাকেই বলে বে-আইনী বাজার বা কালো বাজার।**

এই সমস্যা সমাধানের জন্য বাজারে অতিরিক্ত চাহিদা দূর করা উচিত। এই ব্যাপারে সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ পদ্ধতি হল বরাদ্দ বণ্টন বা রেশন ব্যবস্থা (Rationing System)। কোনো দ্রব্যের অভাবের সময় সরকারিভাবে প্রতিটি ব্যক্তিকে যে নির্দিষ্ট পরিমাণ দ্রব্যটি ব্যবহার করতে দেওয়া হল তাকে বলে বরাদ্দ বণ্টন বা রেশন ব্যবস্থা। প্রকৃতপক্ষে রেশনিং হল সীমিত সম্পদ (খাদ্য বা শিল্পজাত দ্রব্য) বণ্টনের ক্ষেত্রে কৃত্রিম নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা বলবৎ। অর্থনীতিতে রেশনিং বলতে দ্রব্যের চাহিদা ও যোগানের উপর কৃত্রিম নিয়ন্ত্রণ।

রেশন ব্যবস্থার মূল উদ্দেশ্য হল সম্পদের অকাম্য ক্ষয় রোধ করে যথাযথ বণ্টন ব্যবস্থা গড়ে তোলা। রেশনিং-এর মাধ্যমে দ্রব্যের দাম, চাহিদা ও যোগানের নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে সমাজে প্রতিটি স্তরের জনসাধারণের কাছে লব্ধ দ্রব্য ও সেবার প্রাপ্তি সুনিশ্চিত করে তোলা।

এই ব্যবস্থায় রেশন কার্ড বা কুপনের মাধ্যমে প্রতিটি ক্রেতার ভোগ বরাদ্দ সরকার কর্তৃক এমনভাবে স্থির করা হয়, যাতে দ্রব্যটির মোট বরাদ্দের পরিমাণ দ্রব্যটির মোট যোগানের সমান হয়। ক্রেতারা রেশন কার্ড বা কুপনের মাধ্যমে ন্যায্য মূল্যের দোকান থেকে দ্রব্যসামগ্রী সংগ্রহ করতে পারে। এই ব্যবস্থা সফল করার জন্য প্রয়োজন হল খোলা বাজারে দ্রব্যটির কেনা-বেচা বন্ধ করা এবং উৎপাদিত দ্রব্যের সম্পূর্ণ অংশই সরকার কর্তৃক উৎপাদকের কাছ থেকে সংগ্রহ করা। এই জন্যই অনেকে অভিমত প্রকাশ করেন যে, **বরাদ্দ ব্যবস্থা বা ভোগ বরাদ্দ ব্যবস্থা ছাড়া দাম নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা সফল করা সম্ভব নয়।**

■ ১.৯. দাম, সম্পত্তির অধিকার এবং মুনাফা (Price, Property Rights and Profit)

দাম, সম্পত্তির অধিকার এবং মুনাফার সম্পর্ক আলোচনার জন্য, দাম, সম্পত্তির অধিকার এবং মুনাফা বলতে কি বোঝায় তা উল্লেখ করা হল।

কোনো দ্রব্যের সঙ্গে অর্থের বিনিময় হলে ঐ বিনিময় হারকে ঐ দ্রব্যের দাম বলে। **অর্থাৎ দ্রব্যের বিনিময় মূল্য অর্থের মাধ্যমে প্রকাশ করা হলে তাকে বলে দাম।** যেমন, ১ কেজি চাল = ২০ টাকা। সুতরাং একটি দ্রব্যের এক এককের বিনিময়ে যে পরিমাণ অর্থ পাওয়া যায় সেটিই হল ঐ দ্রব্যের দাম। অর্থাৎ কোনো দ্রব্যের দাম অর্থের মাধ্যমে প্রকাশ করা হয়।

সম্পত্তির অধিকার হল একটি নির্দিষ্ট সম্পত্তিতে ব্যক্তির তত্ত্বগত ও আইনগত এবং ব্যবহারগত অধিকার। এই ব্যবহারগত অধিকারের মাধ্যমে ব্যক্তি সিদ্ধান্ত নেয় কি পরিমাণে এবং কিভাবে সম্পত্তি ব্যবহার করবে। পৃথিবীর বহু দেশেই ব্যক্তি নিজে ব্যক্তিগত সম্পত্তির অধিকার সাধারণত আরোপ করে থাকে। যেমন, ব্যক্তি সম্পত্তি ধরে রাখা, সম্পত্তির খাজনা গ্রহণ এবং বিক্রির অধিকার অর্জন করে থাকে। অর্থনীতিতে সম্পত্তির অধিকার সমস্ত ধরনের বাজার লেনদেনের ভিত্তি এবং সমাজে সম্পত্তির অধিকার বণ্টন সম্পদের ব্যবহারগত দক্ষতাকে প্রভাবিত করে থাকে।

অধিকাংশ উন্নত দেশসমূহে সম্পত্তির মালিকানার অধিকার পেটেন্ট, কপিরাইট ইত্যাদি ব্যবহারের মাধ্যমে দুর্লভ বস্তুগত সম্পদ (বাড়ি, গাড়ি ইত্যাদি), অ-মানবিক সৃষ্টিসমূহ (যেমন কুকুর, বিড়াল ইত্যাদি), এমন কি মেধা সম্পত্তি (intellectual property), যেমন, উদ্ভাবন ইত্যাদি ক্ষেত্রেও সম্প্রসারিত করে থাকে।

ধনতান্ত্রিক অর্থনীতিতে ব্যক্তিগত সম্পত্তির অধিকার হল অর্থনীতির ভিতস্বরূপ। ধনতান্ত্রিক অর্থনীতিতে প্রতিটি সম্পত্তির বাজার দাম ব্যক্তিগত সম্পত্তির হস্তান্তরের মাধ্যমে সৃষ্টি হয়ে থাকে। প্রতিটি লেনদেন ঘটে থাকে সম্পত্তির মালিক এবং অন্য বক্তি যে ওই সম্পত্তির অধিকার অর্জনে ইচ্ছুক তাদের মাধ্যমে। সম্পত্তির মূল্য বা দাম যার মাধ্যমে লেনদেন ঘটে থাকে সেটি নির্ভর করে সম্পত্তিটি প্রতিটি ব্যক্তির কাছে কি পরিমাণ মূল্যবান তার উপর।

দ্রব্য বিক্রয়ের ফলে দ্রব্যটির জন্য যে দাম প্রদান করা হয় এবং ঐ দ্রব্যের জন্য যে ব্যয় হয় তাদের পার্থক্যকে বলে মুনাফা। এখানে ব্যয় বলতে দ্রব্য ও সেবা বাজারে আনার জন্য উদ্যোক্তাকে যে ব্যয় বহন করতে হয় এবং দাম বলতে ওই দ্রব্য বা সেবার জন্য ক্রেতা যে অর্থ প্রদান করে।

দাম, সম্পত্তির অধিকার ও মুনাফার মধ্যে সম্পর্ক বর্তমান। ব্যক্তিগত সম্পত্তির অধিকার যে ভোগ করে সেই অধিকার অপরকে প্রদান করার জন্য যে অর্থ সম্পত্তির মালিক পেয়ে থাকে সেটিই হল ঐ সম্পত্তির দাম। এই দাম এবং সম্পত্তিটি বাজারে বিক্রির উদ্দেশ্যে উপস্থিত করবার জন্য সম্পত্তির মালিককে যে ব্যয় করতে হয়েছে তার পার্থক্যই হল ঐ সম্পত্তির মুনাফা। এখানে মুনাফার পরিমাণ মূলত নির্ভর করে সম্পত্তির বাজার চাহিদা ও বাজার দামের উপর।